নীলপদ্ম

গৌরী সেন



নীল পদ্ম

গৌরী সেন

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
বিমলারঞ্জন চন্দ্র
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
দোল পূর্ণিমা—১৩৯২

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

অলংকরণ :
তাপস দত্ত

মূল্য :—নয় টাকা মাত্র

প্রিন্টার :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা-৬

মেঘের দেশে পিংকি

ঝড়ো বাতাসের ধাক্কা খেয়ে পিংকির হঠাৎ খেয়াল হল পার্কে সে প্রায় একা দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে একটা ভয়ঙ্কর কালো দৈত্যের মত মেঘ ঝড়ের সঙ্গে ভীষণ জোর লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে, আর লড়াই করতে করতে ক্রমশ নীচের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

—কিন্তু সব্বাই কোথায় গেল ? ঝর্নাদিদি, মিষ্টিদিদি ওরা আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল ? কি করব এখন ? কি করে বাড়ী যাই ?

এই প্রথম পিংকি কলকাতায় এসেছে। এর আগে কখনও আসেনি। এসেছে মার সঙ্গে মামাবাড়ী বেড়াতে।

—মা, ওমা, আমি মিষ্টিদিদি আর ঝর্নাদিদির সঙ্গে পার্কে যাই ?

পিংকির মা ভীষণ ভয় পেয়ে বলেন,— নাঃ, নাঃ, তুমি কিচ্ছু চেন না, তুমি কোথাও যাবে না।

—পার্ক ত কাছেই। অনেক দূর ত নয়, মিষ্টিদিদি বলেছে। যাই না, মা। বলেই পিংকি বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

পিংকির মা দৌড়ে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে আসেন,—তুমি যাবে না, কাছে হলেই বা কি। তুমি ত নিজে চিনে আসতে পারবে না।

—হ্যাঁ মা পারব। তাছাড়া মিষ্টিদিদি আর ঝর্নাদিদি ত সঙ্গেই থাকবে।

মিষ্টিদিদি আর ঝর্নাদিদি এসে দাঁড়ায়।

—ও পিসিমা, পিংকিকে আমাদের সঙ্গে পার্কে যেতে দাও না, আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবে। খুব কাছেই পার্ক। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

পিংকির মা বলেন,—পিংকি, মিষ্টিদিদি আর ঝর্নাদিদির সঙ্গে যাও, কিন্তু পার্ক থেকে কোথাও যাবে না। মিষ্টিদিদি ও ঝর্নাদিদির কাছে কাছেই থাকবে। ওদের সঙ্গেই বাড়ী ফিরে আসবে।

পিংকি তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়ে, যদি মা মত পাল্টে ফেলে তাই মার দিকে চেয়ে বলে,—মা যাচ্ছি, টা-টা।

পিংকি মিষ্টিদিদি আর ঝর্নাদিদির সঙ্গে পার্কে এসেই স্লিপটার উপর উঠে পড়ে। একবার দোলনায় চড়ে দোলও খেয়ে নেয়।

হঠাৎ একটা সুন্দর ফড়িং দেখে নেমে পড়ে দোলনা থেকে। ঘাসের মধ্যে এখান থেকে সেখানে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ফড়িংটা। পিংকিও ফড়িংটার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। হঠাৎ মাঠের শেষে এক জায়গায় ফড়িংটা দাঁড়িয়ে পড়ে, পিংকিও বসে পড়ে ওর পাশে। —ওমা, বড় ফড়িংটা কেমন ছোট্ট আর একটা ফড়িংয়ের সঙ্গে ভাব করছে সামনের ঠ্যাং দুটো নেড়েচেড়ে।

পিংকি দেখতেই থাকে।

—একি, একি, হাওয়ায় উড়ে যাব যে! পিংকি পার্কের চারদিক তাকায়। কেউ কোথাও নেই। যে দু-একজন ছিল তারাও ছুটে পালাচ্ছে। ভীষণ ঝড় আসছে। কালো মেঘ-দৈত্যটা কিছুতেই হাওয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে পারছে না। এবার ধাক্কা খেয়ে প্রায় মাটির কাছে চলে এসেছে।

....জ্বল্....জ্বল্....জ্বলাৎ! দৈত্যটা তার আগুনের জিভটা বার করে তার চার পাশটা চেটে-চুটে দেখে নিল।

....কড়কড়, কড়কড়, কড়াৎ! পিংকি এবার কেঁদে ফেলে।

—ও মাগো, আমি কি করে বাড়ী যাব?

কাঁদতে কাঁদতে পিংকি পার্কের গেটের দিকে দৌড়তে থাকে। গেটের কাছটায় অনেকগুলো বড় ঝাঁকড়া গাছ। এমনিতেই অন্ধকার, এখন মেঘ করে আরও অন্ধকার।

টিপ-টিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। পিংকি চাইছিল তাড়াতাড়ি রাস্তায় যেতে। অন্ধকারে ওর ভয় করছিল।

খুটুং-খ্যাচ, যেই না বের হবার জন্য পিংকি গেটটা খুলেছে,—এটা কি? ওরে বাপরে, মা, মা....অ্যা....অ্যা... ভ্যা।

সামনেই আকাশের কালো দৈত্যটা দাঁড়িয়েছিল, ধমক দিল, —চুপ, একদম চুপ। আমি কান্নাকাটি একদম পছন্দ করি না।

পিংকি কি আর করে, ভয়ে চুপ করে যায়।

কালো বড় বড় লোমের মত কি যেন সারা গা ভর্তি, বিরাট চেহারা। আর জিভ, ওরে বাবা…কত বড়, আগুনের তৈরী…মাঝে মাঝে এদিক ওদিক বুলিয়ে নিচ্ছে। পিংকি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।

—তুমি কে ? এত বকছ কেন ? অনেক সাহস করে পিংকি জিজ্ঞাসা করে।

—আমি ? আমি এই আছি এই নেই, মেঘ-দৈত্য বলে।

—তার, তার মানে কি ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝবে কি করে, স্কুলে পড় ?

—পড়ি ত। ক্লাস ওয়ানে।

—স্কুলে পড় অথচ এইটুকু জানো না। এখন এইখানে আছি, খুব কষে বৃষ্টি ঝরিয়ে পালিয়ে যাব।

—কোথায় যাবে ?

—আচ্ছা বোকা মেয়ে ত। যাও, যাও, গাছের নীচে দাঁড়াও, এখনি খুব জোরে জোরে বৃষ্টি হবে।

পিংকি ছুটে গাছের নীচে চলে যায়।

হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে। কালো দৈত্যটা রাগে গরগর করতে থাকে, আর তার মস্ত গা-টা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে।

বৃষ্টি পড়তে থাকে ঝম্-ঝম্-ঝম্।

কতক্ষণ ধরে পিংকি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভিজছিল মনে নেই। চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও আস্তে আস্তে কমছে।

—এইবার কালো দৈত্যটা আসার আগেই পালিয়ে রাস্তায় চলে যাই বাবা। কখন যে মার কাছে যাব।

—এই, এই মেয়েটা, কি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ? বলতে বলতে কালো দৈত্যটা এসে হাজির। পিংকি আশ্চর্য হয়ে দেখল, দৈত্যের গায়ে কালো রংটা কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে।

পিংকি বলল,—আমি বাড়ী যাব যে, মার কাছে যাব।

—যাবে, যাবে, তার আগে আমাদের মেঘের দেশটা একটু বেড়িয়ে আসবে চল। আমাদের মেঘের দেশটা তোমাদের কলকাতা থেকে অনেক সুন্দর।

—তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন চল ত। ধমক দেয় দৈত্যটা।

দৈত্যটা তার ধোঁয়া-ধোঁয়া হাতটা বাড়িয়ে দেয় পিংকির দিকে, —হু-হু-হু-হুস্।

পিংকি দেখে কি, ও একটা নতুন দেশে এসে গেছে। মেঘের বাড়ী, মেঘের দেয়াল, মেঘের রাস্তা। আর সেসব গুলোতে কখনও রং ধরছে সাদা, কখনও কালো, আবার কখনও রামধনু। সারা দেশটা আলোময় আলো। মেঘ-দৈত্যরা পালা করে লম্বা লম্বা জিভগুলো বার করছে, আলোয় ঝলসে যাচ্ছে দেশটা।

পিংকি দেখল, সেই ঝল্‌মলে আলোয় খেলা করছে ছোট ছোট সাদা, কালো ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ-দৈত্যদের ছানা-পোনারা।

মেঘ-দৈত্য বলল,—এই, এই মেয়েটা, তুমি আমাদের ঐ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে একটু খেলা কর ত, আমি এখনি আসছি।

পিংকি আর কি করে, অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গুটি-গুটি এগোতে লাগলো মেঘের মাঠের কাছে, যেখানে সাদা, কালো, ধোঁয়া-ধোঁয়া বাচ্চারা খেলা করছিল।

পিংকি ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়।

—তোমরা কি খেলছ ভাই? আমাকে তোমাদের সঙ্গে খেলতে নেবে?

—আমরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছি। কালো মেঘের ছানা জবাব দেয়।



কালো দৈত্যটা আসার আগেই পালিয়ে রাস্তায় চলে যাই বাবা ! পৃষ্ঠা ১১

—যুদ্ধ! আমিও খেলব।

—তোমার নাম কি? নাম কি? সাদা মেঘের বাচ্চারা পিংকির চারদিকে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে বলল।

—আমার নাম পিংকি।

সাদা মেঘের বাচ্চারা ওমনি নেচে নেচে গেয়ে ওঠে, পিংকি, পিংকি, শুনবে গান কি?

গুড়ু-গুড়ু, গুম-গুম আমাদের গান,
হাসি-খুশি মজাদার সকলের প্রাণ।

—তুমি কোন্ দলে থাকবে? কালো মেঘের ছানারা গম্ভীর গলায় বলল।

—আমি ভাই সাদাদের দলে।

—বেশ, বেশ, তাহলে এবার যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা শুরু হোক। কালো মেঘের ছানারা বলল।

সাদা মেঘের বাচ্চারা পিংকির হাত ধরে বলল,—হ্যাঁ, শুরু হোক।

—ওরে বাবা! পিংকি দেখে কি, কালো মেঘের ছানাগুলো ভারি দুষ্টু। সব্বাই এক-একজনের সঙ্গে গা ঘেঁষে ঘেঁষে দল বেঁধে ত নিলই, ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘের ছেলেপিলে গুলোকেও চুপিচুপি নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নিল।

আর সাদা মেঘের বাচ্ছাগুলো বেজায় ভাল মানুষ। তারা এদিক ওদিক আলাদা আলাদা ঘুরে ঘুরে মিষ্টি সুরে আপন মনে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। কালো মেঘের ছানারা কি কাণ্ড করছে সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই। পিংকির কিন্তু খুব রাগ হয়। ও চীৎকার করে ওঠে,—এই, এই কালো মেঘেরা, তোমরা তোমাদের দল ভারী করছ কেন? ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ বাচ্চাদের শুধু নিজেদের সঙ্গে নিচ্ছ কেন? আমরা হেরে যাব না, বারে!

—কি হল? কি হল? পিংকি, পিংকি!

পিংকি সব বলতেই সাদা মেঘেরা হেসে গড়িয়ে বলল,—পিংকি,

কালো মেঘেদের দুষ্টুমির কথা ছেড়ে দাও। ওরা যেমন রাগী তেমনি ঝগড়াটে। মাঝে মাঝে আমরা সবাই ওদের সঙ্গে একদম আড়ি করে দি। থাকিই না ধারে কাছে। তখন নিজেরাই সেধে সেধে এসে ভাব করে।

ওমা, তাই না শুনে কালো মেঘের ছানাদের কি রাগ! গর্‌গর্ করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাদা মেঘের বাচ্চাদের উপর। পিংকি এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। এদের কাণ্ড দেখে ত হাঁ।

সাদা মেঘেরা ত তৈরী ছিল না। কালো মেঘের ছানাদের সঙ্গে পারবে কেন?

ঝিলিক্....ঝিলিক্....ঝিলিক্! একি ভয়ানক ব্যাপার! পিংকি দেখে কি, কালো মেঘের ছানারা তাদের আলোর জিভগুলো এক-একবার করে বার করছে আর সাদা ছানাদের জিভ দিয়ে জড়িয়ে সোজা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিচ্ছে, তারপর গপাৎ। এরা যে এক-একটা রাক্ষস।

পিংকি আর সহ্য করতে পারে না, চীৎকার করে ওঠে,—এ কি করছ তোমরা, এ কি করছ? নিজের বন্ধুদের খেয়ে ফেলছ? বন্ধুদের তোমরা একটুও ভালবাস না? কি ভীষণ খারাপ তোমরা? তোমরা খুব দুষ্টু। বলেই পিংকি কাঁদতে থাকে।

—ভারি ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে ত এটা। চল ত সবাই, এই কাঁদুনে মেয়েটাকেই সব চেয়ে আগে শেষ করি। বলতে বলতে কালো মেঘের বাচ্ছাগুলো ছুটে আসে।

ভীষণ ভয় পেয়ে যায় পিংকি। কালো মেঘের ছানাগুলোর আগুন জিভগুলো বার বার বের হচ্ছে। গলা দিয়ে রাগ-রাগ গুম-গুম আওয়াজ হচ্ছে। পিংকি কি করবে ভেবে না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে থাকে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। কালো মেঘের ছানাগুলোও তাড়া করে আসছে।

—মা, ওমা, তুমি কোথায় ? দেখ না, কালো মেঘের দুষ্টু বাচ্চা-গুলো আমাকে মারতে আসছে। মা, মাগো…ও…ও। পিংকি আর দৌড়তে পারে না, পড়ে যায়। পিংকি বেশ বুঝতে পারছে, ও নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

ঝপ্…ঝপ্…ঝপাং…।

—এই দেখ, আরে আমাদের মেয়ে ত এখানে! আর আমরা কোথায় কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

টর্চের আলো মুখে পড়তেই পিংকি চেয়ে দেখে, মামা আর তার কয়েকজন বন্ধু সামনে দাঁড়িয়ে। মামা তাড়াতাড়ি পিংকিকে কোলে তুলে নেন। পিংকি এতক্ষণ আস্তে আস্তে কাঁদছিল, মামাকে দেখে জোরে জোরে কেঁদে ওঠে।

পিংকির মামা তার ভিজে মাথার উপর হাত বুলিয়ে বলেন,—আর কেঁদ না, পিংকিসোনা। ভয় কি ? আমরা তো এসে গেছি। চল বাড়ী যাই এবার।

পিংকি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,—মামামণি, আমি মার কাছে যাব।



তিতি ও ড্রাগন

ছোট্ট তিতির অসুখ। জ্বর আর ছাড়ছেই না। কত…কতদিন হয়ে গেল। ও স্কুলে যেতে পারে না, সামনের মাঠে খেলতে যেতেও পারে না। খালি খালি ওষুধ খেতে হয়। ট্যাবলেটগুলো যা বিচ্ছিরি, গিলতে কষ্ট হয়। শিশির ওষুধ গুলোই কি ছাই ভাল ? তবে একটা ওষুধ আছে, সেটা খেতে একদম অরেঞ্জ-স্কোয়াশের মত। তিতি সেটা সব শিশির পিছনে রেখে দিয়েছে। কেউ যদি চেয়ে বসে।

সারাদিন অবশ্য মাত্র দুবার এ ওষুধটা খাবার কথা। তিতি কিন্তু মাঝে মাঝেই হাতে কয়েক ফোঁটা ঢেলে চেটে চেটে বেশ আরাম করে খায়, কেউ অবশ্য জানে না।

একদিন হয়েছে কি, সন্ধ্যেবেলা তিতি বিছানার উপর লুডো সাজিয়ে বসে আছে। ওর বন্ধু চিকু রোজ আসে এসময় ওর সঙ্গে খেলতে।

—দূর ছাই, চিকুটা যে কি, এখনও আসছেই না। সন্ধ্যে হতে হতে রাত অন্ধকার হয়ে যাবে। খুব বেশী জ্বর আসবে, আর তখনই শুয়ে পড়তে হবে। না হলে মা খুব বকুনি দেবে।

—যাই, ততক্ষণে অরেঞ্জ-স্কোয়াশ ওষুধটা একটু খাই। তিতি এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়, একি কাণ্ড ?

দেখে কি, একটা বেড়ে টিকটিকি তার মোটা লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ শিশিটাকে জড়িয়ে ধরে টানছে। শিশিটা একটু কাত হল।

—ওমা, এসব কি হচ্ছে! আলগা করে লাগানো ছিপিটা একটু ফাঁক করে ফেলল টিকটিকিটা।

চক্-চক্-চক্ ! আরে, আরে, টিক্‌টিকিটা জিভটা ঢুকিয়ে শিশির সব ওষুধ খেয়ে ফেলছে যে !

—এই, তুমি আমার সব ওষুধ খেয়ে ফেলছ কেন ? আমি কি খাব ?

এদিকে টিক্‌টিকিটা ক্রমশঃ বড় হয়ে যাচ্ছে। লেজটা টেবিল থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। এতবড় চেহারা যেন বড় একটা কুমির। কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে তিতির দিকে। তারপর করল কি, শিশিটা সামনের দু-পায়ে তুলে চক্‌চক্ করে সব ওষুধটা খেয়ে ফেলল।

আরও বড় হয়ে যাচ্ছে টিক্‌টিকিটা। টেবিলটা মড়্‌মড়্ করে উঠল। শিশিটা টেবিলে রেখে ও তাড়াতাড়ি মাটিতে লাফ দিয়ে নামল।

প্রায় সমস্ত ঘরটাই জুড়ে গেছে ওর মস্ত শরীরে। মাথাটা ঠেকেছে ছাদে। চোখে কি রাগ-রাগ ভাব ! নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন আর ধোঁয়া বের হচ্ছে, সারা গায়ে বড় বড় কাঁটা। ঐ অদ্ভুত জন্তুটা এবার পায়ে পায়ে তিতির দিকে এগিয়ে আসে। ওর নিঃশ্বাসের আগুনে তিতির গায়ে ছ্যাঁকা লাগে।

—ওরে বাবা, এটা যে একটা ড্রাগন ! বাবা কাল এটারই ছবি দেখাচ্ছিল না আমাকে।

—ড্রাগন ! ড্রাগন ! ওমা, শীগগির এসো, ড্রাগনটা আমাকে খেয়ে ফেলবে। তিতি ভয় পেয়ে চীৎকার করতে থাকে।

—খ্যাঁউ, খ্যাঁউ, খ্যাঁউ ! ঠিক চিনেছ, বলেই ভীষণ বড় বড় দাঁত বার করে হাসতে থাকে ড্রাগনটা। তারপর তিতি কিছু বলার আগেই ওকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে থাকে।

—এই থাম, থাম, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে ? কিন্তু কে শোনে কার কথা। ড্রাগনটা ছুটছে ত ছুটছেই।

শেষে থামল একটা পাহাড়ের কাছে এসে। সামনেই প্রকাণ্ড



মাঝে মাঝে দূর থেকে ড্রাগনদের চীৎকার শুনতে পাই। পৃষ্ঠা ২১

একটা গুহা, সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল ড্রাগনটা। একটু এগোতেই তিতি দেখে, আলোয় আলোময় চারদিক। সেখানে ছোট বড় কত কত ড্রাগন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এত আলোর মধ্যে কিন্তু কতগুলি ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ। সব শেষের অন্ধকার ঘরটা খুলে তিতিকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে ড্রাগনটা ধমকে বলে,—এখানে চুপ করে বসে থাক। আমি পূজো দেখে আসছি। সরাৎ করে নাক দিয়ে আগুন ছিটকে পড়ে চারিদিকে।

—পূজো! তিতি আগুন থেকে সরে গিয়ে বলে।

—আজ আমাদের ড্রাগন-দেবতার পূজো।

—আমাকে নিয়ে যাবে না?

—খিক্, খিক্, খিক্! ড্রাগনটা বিচ্ছিরি রকমের হাসতে থাকে। যাবে, যাবে। সাতদিন পর ঐ দেবতার কাছে তোমাকে বলি দেওয়া হবে। তবে তুমি যা বিচ্ছিরি রোগা, তোমার গায়ের মাংসে আমাদের একজনেরও পেট ভরবে না। বলতে বলতে ড্রাগনটা চলে যায়।

অন্ধকারে বসে বসে তিতির ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। হঠাৎ উঃ-উ-হু-হু—

তিতির ঘুম ভেঙে যায়,—একি রে বাবা, ভূতটুত আছে নাকি ঘরে?

তিতি আবার খুব মন দিয়ে শোনে,—উঃ—হু—হু⋯কেউ যেন আস্তে আস্তে কাঁদছে।

—এই, তুই কে রে? ভূত নাকি!

—না-না, আমি ভূতটুত নই, আমি মাংচু।

—তা, তুই কাঁদছিস কেন?

—কাঁদছি কি এমনি,—উঃ—হু—হু, ওরা আমাকে ধরে এনেছে বলি দেবে বলে।

—আমাকেও ত ধরে এনেছে, আমি কি কাঁদছি?

—তুই কে? কাছে আয় না।

—আমি তিতি। দেখ মাংচু, ড্রাগনটা ভুলে দরজা বন্ধ না করেই চলে গেছে। তিতি মাংচুর কাছে এসে বলে।

—চল, আমরা পালাই।

—ওরা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবে।

তিতি বলে,—ওরা আজ সব্বাই পূজোয় ব্যস্ত। চল না, বাইরে গিয়ে দেখি, পালাতে পারি কিনা।

তিতি আর মাংচু ত্বজনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—সত্যি ত, দরজাটা খোলা, মাংচু বলে। ওরা বাইরে চলে আসে।

—দেখ মাংচু, দরজার পাশ দিয়ে একটা সরুমত রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবে একটু অন্ধকার।

—হ্যাঁ।

—চল, ঐ রাস্তাটা ধরে পালাই। বলেই তিতি তার রোগা-রোগা হাত দিয়ে মাংচুর হাত ধরে। তারপর চুপিচুপি এগোতে থাকে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ড্রাগনদের চীৎকার শুনতে পায়। হঠাৎ ত্বজনে দেখে, খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দে তিতি প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলেছিল আর কি।

চারদিকে ফুটফুটে জোৎস্না। পাহাড়ের উপরের দিকে তাকিয়ে তিতি দেখে, পাহাড়ের উপর একটা সাদা সুন্দর রাজপুরী। তিতি বলে,—চল মাংচু, ঐ রাজপুরীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। বলেই দৌড় লাগাতেই মাংচু ওর হাত ধরে ফেলে।

—আরে, ওটা ত ড্রাগন রাজার বাড়ী।

—তাই নাকি! কি সুন্দর দেখতে রাজপুরীটা।

—সুন্দর হবে না? মানুষের আর জন্তু-জানোয়ারের হাড় দিয়ে তৈরী সমস্ত রাজপুরীটা।

—ওরে বাবা, কত কত মানুষ মেরেছে তাহলে?

মাংচু বলে,—সারা পৃথিবী থেকে ওরা অনেক অনেক মানুষ ধরে নিয়ে আসে। সবাইকে কিন্তু ওরা তখনই খায় না।

—তবে ?

—ওদের দিয়ে ড্রাগনরা নিজেদের সব কাজ করায়।

—কি কাজ ?

—এই খাবার-দাবার জোগাড় করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, ঘরদোর তৈরী করা, আরও কত কি। ড্রাগনগুলো বেজায় কুঁড়ে। কেবল বেড়িয়ে বেড়াবে, খাবেদাবে মজা করবে। গায়ে ত ওদের বেজায় জোর, তাই সবাই ভয় পায়।

—তুই এসব কথা জানলি কি করে মাংচু ?

—আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় সব লোককেই ত ওরা ধরে নিয়ে এসেছে। যেদিন আমাকে ধরে আনলো, সেদিন আমাদের গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে দেখা। গুহার মধ্যে যে ঘরটায় ছিলাম সেই ঘরটা পরিষ্কার করছিল। কেউ ছিল না কাছে। ও কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলল আমাকে।

—তারপর।

—ড্রাগনগুলো নিজেরা খুব খায়-দায়। কিন্তু মানুষগুলোকে একদম খেতে দেয় না। আর একটু কথা না শুনলেই যা মারে ল্যাজ দিয়ে। মার খেতে খেতেই লোকগুলো মরে যায় তাড়াতাড়ি। তারপর ওদের আরও মজা। দিব্যি করে মাংস খায়, হাড়গুলো দিয়ে বাড়ী তৈরী করে।

—তবে কাজ নেই বাবা রাজপুরীতে গিয়ে। চল, আমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাই, তিতি বলল।

একটু এগোতেই সামনে বিরাট বন। তিতি বলে,—মাংচু, কোথাও লুকিয়ে রাতটা কাটিয়ে দি। এখন অন্ধকারে জঙ্গলে চলতেই পারব না, রাস্তাও হারিয়ে ফেলব।

—ঠিক বলেছিস। চল, ঐ ঝাঁকড়া বটগাছটার ওপরে উঠে লুকিয়ে থাকি।

—কিন্তু আমি ত সে গাছে উঠতেই পারব না। কি করব ?

মাংচু বলল,—আমি আগে উঠি তারপর তোকে তুলে নেব। বলেই মাংচু তর্‌তর্ করে গাছে উঠে যায়।

পাশাপাশি দুটো মোটা ডালে বসার জায়গা ঠিক করে পকেট থেকে দড়িটা বার করে ঝুলিয়ে দেয় সে। ডাক দেয়,—তিতি, তুই দড়িটা কোমরে বেঁধে ফেল, আমি তোকে টেনে তুলছি। তুই যা রোগা, তোকে তুলতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

তিতি দড়িটা হাতের কাছে পেয়েই কোমরে বেঁধে নেয়। আর মাংচু এক টানে ওকে উপরে তুলে নেয়।

—তোর গায়ে বেশ জোর তো। তা, দড়িটা পেলি কোথায় ?

—একটা শক্ত দড়ি সব সময় আমার সঙ্গে থাকে।

তিতি ভাল করে বসতে বসতে বলে,—ভাগ্যিস তোর কাছে দড়ি ছিল, তাই না আমিও গাছে উঠতে পারলাম।

এমন সময়....

—ও ব্যাঙ্গমা, ও ব্যাঙ্গমা।

—কেন ? কেন ব্যাঙ্গমী ?

—আমাদের গাছে কারা যেন এসেছে ?

—দুটো খোকা-খুকি।

তিতি ও মাংচু দেখে কি, যেখানে ওরা বসে আছে তার কাছেই গাছের কোটরে দুটো বড় বড় পাখি বসে আছে।

—ও খোকা-খুকি তোরা কে ? কে তোরা ? ব্যাঙ্গমা বলে।

তিতি বলে,—আমি তিতি, ও মাংচু। আমাদের দুজনকেই ড্রাগনরা ধরে এনেছিল ওদের পূজোয় বলি দেবে বলে, তারপর খাবে।

—আমরা তাই পালিয়ে এসেছি। মাংচু বলে।

—ঐ দেখ, ড্রাগনগুলো তোদের দুজনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ব্যাঙ্গমা বলে।

ওরা দেখে কি, দশটা বড় বড় ড্র্যাগন রাগে গরগর করতে করতে

এদিকে আসছে। থেকে থেকে ওদের নাক দিয়ে আগুন বের হয়ে চারদিকটা পুড়ে যাচ্ছে।

তিতি ভয় পেয়ে বলে,—মাংচু, আর রক্ষে নেই। এবার ওরা আমাদের ঠিক দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলেই আস্ত গিলে ফেলবে। কি হবে ?

পাখি দুটো গলা বার করে বলে,—ভয় পাস না খোকা-খুকিরা, এই নে, আমাদের এক-একটা করে পালক। শীগগির গায়ে বুলিয়ে নে, আর পাখি হয়ে যা। তোদেরকে কেউ চিনতে পারবে না।

—আবার মানুষ হব কি করে ? মাংচু জিজ্ঞাসা করে।

—তার জন্য কোন চিন্তা নেই। যেই মানুষ হতে ইচ্ছে করবে পালকের উল্টো দিকটা শুধু কপালে ঠেকিয়ে নিবি। তাহলেই আবার মানুষ হয়ে যাবি।

তিতি আর মাংচু পালকটা নিজেদের গায়ে বুলিয়ে নেয়। সুন্দর দুটো পাখি হয়ে যায় দুজনে। তিতি হয়ে যায় একটা তিতির পাখি আর মাংচু হয়ে যায় সাদা ধবধবে পায়রা।

ড্রাগনগুলো গাছটার কাছে চলে আসে, এদিক ওদিক খোঁজা-খুঁজি করতে করতে চলে যায়।

তিতি আর মাংচু হেসে কুটিপাটি,—বাক্-বাকুম, বাক্-বাকুম —কি বোকা, কি বোকা !

ব্যাঙ্গমা বলে,—ওদের মোটেই বোকা ভেব না খোকা-খুকিরা। এখনই ওরা সমস্ত বনটাই ঘিরে ফেলবে। তখন পাখি সেজে পালাতে পারবে না।

—তাহলে কি হবে ব্যাঙ্গমা-দাদু ? আমরা কি করব তবে ?

—তোরা উত্তর দিকে চলে যা, সেখানে আছে ড্রাগনদের সবচেয়ে বড় বোন তিন মাথা ডাইনী বুড়ী। বন থেকে বেরুবার পথ একমাত্র সেই জানে।

—কিন্তু দাদু, ঐ ডাইনীই যদি আমাদের খেয়ে ফেলে।

—এই বটগাছের লাল-লাল ফলগুলো খুব মিষ্টি, ঠিক যেন এক-একটা লাল আঙ্গুর। এ বটগাছ ছাড়া কোথাও এমন মিষ্টি বটফল পাওয়া যায় না। এ গাছের ফল নিয়ে বুড়ীকে দিবি, বুড়ী খুব খুশী হবে। বুড়ী ভারী লোভী। আর দেখ, খুব ভাল করে কথা বলবি। বুড়ী চোখেও কম দেখে, একটু দূরে দূরে থাকবি। বুড়ী তোদের কিছু করতে পারবে না।

পাতার দুটো ঠোঙা ভর্তি করে তিতি আর মাংচু বটগাছের লাল-লাল ফল নিয়ে নেয়। তারপর ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীকে বলে,—দাদু, দিদা, আমরা এবার তিন মাথা ডাইনী বুড়ীর কাছে যাচ্ছি।

ব্যাঙ্গমা বলে,—দেখবি তোদের দেওয়া এ বটগাছের ফল খেয়ে বুড়ী কি রকম খুশী হবে। এক-একটা করে ফল এক-এক মুখে দেবে, আর খুশীতে তিনটে মাথা এক সঙ্গে নেড়ে বলবে,—আঃ! সে সময় তোরা যা চাইবি বুড়ী তাই দিয়ে দেবে। যা, এখনি তোরা রওনা হয়ে যা।

তিতি আর মাংচু ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীকে প্রণাম করে ঠোঙা মুখে করে উড়তে লাগলো উত্তর দিকে।

ওরা জঙ্গলের উত্তর দিকে এসে পৌঁছয়। দেখে একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে তিন মাথা বুড়ী বসে আছে। সাপের মত মোটামোটা তিন মাথা চুল এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। বুড়ী চিরুনী দিয়ে মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল আঁচড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ইঁদুরের মত বড় উকুন বার করে পাথর দিয়ে ঠকাস-ঠকাস করে মারছে।

তিতির পাখি আর সাদা পায়রা ঝট্ করে ব্যাঙ্গমার দেওয়া পালকের গোড়াটা কপালে ঠেকিয়ে নিল। ব্যস, তিতি আর মাংচু মানুষ হয়ে গেল। তারপর দুজনে এগিয়ে যায় বুড়ীর কাছে।

—পেন্নাম পিসীমা, পেন্নাম।

তিন মাথা বুড়ী চিরুনী-টিরুনী ফেলে তিনটে মাথা নাড়তে নাড়তে

এগিয়ে আসে,—তোরা কে রে ? তোরা কে ?

বুড়ী ত ভাল কোরে দেখতে পায় না, তাই লম্বা-লম্বা হাত বাড়ায়, ওদের খোঁজে। তিতি তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলে,—তুমি ত অনেক দিন আমাদের বাড়ী যাওনি পিসী, তাই আমাদের চিনতে পারছ না। আমরা তোমার ভাই ড্রাগন রাজার ছেলে-মেয়ে।

—কিন্তু বাছারা, কেমন যেন মিষ্টি-মিষ্টি, মানুষ-মানুষ গন্ধ তোদের গায়ে, আমার ভাইপো-ভাইঝির গায়ে ত এমন গন্ধ থাকার কথা নয়।

—আরে, আমরা এখনই একটা আস্ত মানুষের মাংস খেয়ে এসেছি, গন্ধ ত লাগবেই। তা পিসীমা, তোমার জন্য মিষ্টি বটফল এনেছি। নাও, খেয়ে দেখ।

—আরে, আরে, আমার সোনামণিরা ! তোরা খুব লক্ষ্মী, বলেই এক-একটা ফল এক-এক মুখে ফেলতে থাকে বুড়ী। খুশীতে দুটো চোখই বন্ধ করে বলে,—আঃ... আঃ ! তোরাও বাছা অনেক দূর থেকে এলি, তোরাও একটু খা।

—না গো পিসী, তোমার জন্য এনেছি, তুমি খাও। আমরা এখনই মানুষ ধরে খেয়েছি। একটু চুপ করে থেকে তিতি আবার বলে,—পিসী, আমরা কিন্তু একটা মুস্কিলে পড়ে গেছি।

—কি হয়েছে ? কি হয়েছে ? বুড়ী জিজ্ঞাসা করে।

—আমরা জঙ্গল থেকে বের হয়ে গ্রামে যাব মানুষ ধরতে। এই পুরো মাসটা ত আমাদের দেবতার পুজো। বাবাও যাবে গুহা-মন্দিরে পুজো দেখতে। চার-পাঁচটা শক্তপোক্ত মানুষ চাই বাবাকে ঘাড়ে করে মন্দিরে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এ জঙ্গল থেকে বেরুবার রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না।

—তাই নাকি ! তা খুঁজে পাবি কি করে ? আমি ছাড়া কেউ এ রাস্তার খবর জানেই না। এ জঙ্গল থেকে বের হতে হলে আমার কাছে সব্বাইকে আসতে হবে। তা শোন, এখান থেকে একটু বাঁদিকে

এগোলেই দেখবি একটা নদী। নদীর পাড় ধরে আরও একটু এগিয়ে দেখবি একটা ছোট্ট মত পাহাড়। সেই পাহাড়টার ডান দিক দিয়ে ঘুরে এগোবি। দুবার যেই পুরো ঘোরা হবে পাহাড়টা, পৌঁছে যাবি গ্রামে। সেখানে অনেক অনেক মোটাসোটা লোক পাবি। যত ইচ্ছে ধরে নিয়ে যা। তবে দেখ, ঐ ছোট্ট পাহাড়ে একটা আঁকাবাঁকা গুহা আছে, যার নাম বিল্‌বিলি গুহা, তার মধ্যে কিন্তু ঢুকিস না।

—কেন, কেন পিসি? মাংচু প্রশ্ন করে।

—ঐ বিল্‌বিলি গুহায় আছে আয়েশ সরোবর। তাতে ফুটে আছে একটি মাত্র পদ্মফুল—"প্রাণ পদ্ম"। সেই পদ্মে আছে আমার, তোর বাবা, মা, তোদের সব ড্রাগনের প্রাণ। ঐ পদ্ম তুলে কেউ যদি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে করতে বলে,—তোরা মরে যা, তবে আমরা সব্বাই মরে যাব। যদি বলে, তোরা সব্বাই খুব ছোট্ট হয়ে যা, আমরা সব্বাই ছোট্ট হয়ে যাব। যদি বলে, সব্বাই শুধু শুয়েই থাক, তবে আমরা, ড্রাগনরা কেউ কোনদিন উঠে বসতেও পারব না। তাই বলছিলাম, ও গুহায় ঢুকিস না।

—আমাদের কাজ নেই বাবা ও গুহায় ঢুকে। তিতি বলে।

—আমরা যাই পিসী, বাবাকে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য মানুষ ধরে আনি গে।

—হ্যাঁ, যা বাছারা। আবার যখন আসবি তখন আমার জন্যে এই মিষ্টি ফল নিয়ে আসবি, কেমন।

তিতি আর মাংচু ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর পালক গায়ে বুলিয়ে পাখি হয়ে উড়ে যায়। এক মুহূর্তে পৌঁছে যায় নদীর পাড়ে পাহাড়ের ধারে। পালকের গোড়া কপালে ঠেকিয়ে মানুষ হয়ে মাংচু বলে,—তিতি, দেখ সকাল হয়ে গেছে। এখন প্রথম কাজ ড্রাগনদের শেষ করতে হবে। চল, পাহাড়ের বিল্‌বিলি গুহায় ঢুকি।

—চল, কিন্তু মাংচু একটা কথা বলি, ড্রাগনরা আমাদের ধরে

এনেছে ঠিক কিন্তু মেরে ত ফেলেনি। আমরা ওদের সবাইকে মেরে ফেলব?

মাংচু ভীষণ রেগে যায়। বলে,—ঐ শয়তানদের মেরে না ফেললে ওরাই আমাদের খেয়ে ফেলবে, তাতো জানিস।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুই রাগ করছিস্ কেন? তুই ফুলটা পুকুর থেকে নিয়ে আয়। ফুলটা ছিঁড়ে মন্ত্রটা আমি বলব।

—বেশ। মাংচু আর তিতি গুহার ভিতর ঢোকে, অনেক আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে ওরা একটা পুকুরের ধারে এসে পৌঁছায়। দেখে কি, ঐ পুকুরে ফুটে আছে লাল রঙের একটিমাত্র সুন্দর পদ্ম। মাংচু পদ্মটা তুলে এনে তিতির হাতে দেয়।

যেই না পদ্মটা তোলা, চারদিক থেকে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ, মরে-মরে, হাঁউ-হাঁউ করে ছুটে আসতে লাগলো ড্রাগনেরা। রাজা ড্রাগন, মন্ত্রি ড্রাগন, ছোট-বড় সব ড্রাগন ছুটে আসে, কেউ দৌড়তে দৌড়তে, কেউ লাফাতে লাফাতে, তিন মাথা ড্রাগন ডাইনী বুড়ীও তিনটে মাথা নাড়তে নাড়তে প্রায় গড়াতে গড়াতে আসে।—ওরে দুষ্টু ছেলেমেয়েরা, তোদের আজ আস্ত চিবিয়ে খাব, আস্ত চিবিয়ে খাব।

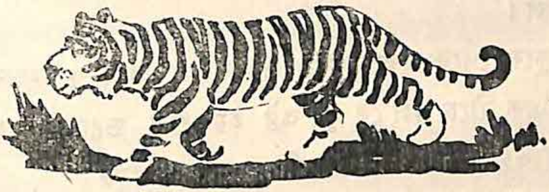
মাংচু বলে,—তিতি, শীগগির পদ্মটা ছিঁড়ে মন্ত্র পড়, আর দেরী করিস না। শুনছিস ত ড্রাগনগুলোর চীৎকার। এখনই ওরা গুহায় ঢুকে পড়বে।

তিতি পদ্মটা ছিঁড়তে শুরু করে, আর চীৎকার করে বলতে থাকে,—তোরা খুব ছোট্ট হয়ে যা, খুব ছোট্ট। আর কখনও মানুষ ধরে খেতে পারবি না, জন্তুজানোয়ার কিছু খেতে পারবি না। যেই না তিনবার বলা, বাইরের গোলমাল শান্ত, ড্রাগনদের আর কোন চীৎকার শোনা যায় না। তিতি আর মাংচু গুহার বাইরে এসে দেখে, চারদিকে হাজার হাজার টিকটিকি।

ও তিতি, তিতি, ওঠ মা। বাঃ, আজ তোর একদম জ্বর নেই। তিতির

মা তিতির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তিতিকে কোলে তুলে নেন।

তিতির চোখ কিন্তু টেবিলের সেই অরেঞ্জ-স্কোয়াশের মত খেতে ওষুধের শিশিটার দিকে। দেখে, সত্যি একটা বড় মত টিকটিকি শিশিটা জড়িয়ে বসে আছে, আর তার দিকে রাগ-রাগ মুখে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে।



মা ও ছেলে

ভীষণ গরম। বৃষ্টি কিছুতেই আর হয় না। গরমে লোকে হাঁসফাস, রাতে ঘুম নেই।

সকলে রোজই ভাবে কাল ঠিক বৃষ্টি হবে। এমনি করে চৈত্র গেল, বৈশাখ গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসও যায় যায়। প্রত্যেক বাড়ীর কুয়ো শুকিয়ে ভেতরের মাটি ফুটিফাটা।

গ্রামের মাঝখানে ছিল একটা মস্ত বড় কুয়ো। তার জল কখনও শুকোয় না। গ্রামের মানুষ কি আর করে, ঐ কুয়ো থেকে জল নিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কুয়ো থেকে জল তুলতে খুব কষ্ট। একে ত এতবড় কুয়ো, তার উপর এত নীচে জল যে খুব কষ্ট হয় জল ভরতে। তবু উপায় নেই, সবাই কষ্ট করেই জল ভরে নিয়ে যায় বাড়ীতে।

একদিন হয়েছে কি, বিষ্টু, কালিদাস, আর গোবিন্দ, তিনজনের মা এল জল নিতে।

—আরে, তোমরাও জল নিতে এসেছ? বলল, গোবিন্দের মা।

কালিদাসের মা বলল,—বল কেন, বাড়ীর কুয়োতে একফোঁটা জল নেই। তাই আসতেই হল।

—আমাদের কুয়োতেও জল নেই। না হলে এই সন্ধ্যেবেলা এত কষ্ট করে এখানে জল নিতে আসি, বিষ্টুর মা বলল।

—যা বলেছ, এত নীচে জল যে দড়ি টানতে টানতে প্রাণটা বেরিয়ে যায়, কিন্তু জল না হলে ত চলে না। তাই আমাকেও আসতেই হল, গোবিন্দের মা বলল।

ওরা তিনজনে অনেক কষ্ট করে জল তুলে প্রথমে ভাল করে চান করল।

কালিদাসের মা বলল,—এখন একটু ভাল লাগছে। এসো, এখন একটু বসি, তারপর না হয় কলসীতে জল ভরে বাড়ী যাব। কি বল?

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, একটু বসি, গোবিন্দের মাও বলল।

—আচ্ছা কালিদাসের মা, পরশুদিন তোমার কালিদাস বাড়ী ফিরেছে না?

—হ্যাঁ গো, এই পাঁচ বছর পর কাশী থেকে পড়াশুনো করে আমার কালিদাস পরশুদিন বাড়ী ফিরেছে। তা কালিদাস কত শাস্তর যে শিখে এসেছে কি বলব। তাকে নিয়ে ত পাড়ায় হৈচৈ পড়ে গেছে।

—ও তাই নাকি?

—শুধু কি পাড়ায়, আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকেরাও এসে সারাক্ষণ ভীড় করে আছে আমাদের বাড়ীতে। বাছার আমার খাবার ঘুমোবার সময় আছে!

—বল কি?

—তবে আর বলছি কি! ও এমন পণ্ডিত হয়ে এসেছে, যাকে যা বলছে তাই সত্যি হয়ে যাচ্ছে। কখন এর মনের কথা বলে দিচ্ছে, কখন ওর রোগ সারাচ্ছে, সারাদিনে সময় নেই। এই দেখ না, কাল লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে নিয়ে এল আমার বাড়ী। লক্ষ্মীর অসুখ কিছুতেই সারছে না। বাছা কি যে মন্ত্র পড়ে ওষুধ দিলে, আজ দেখ কেমন ছুটোছুটি করছে।

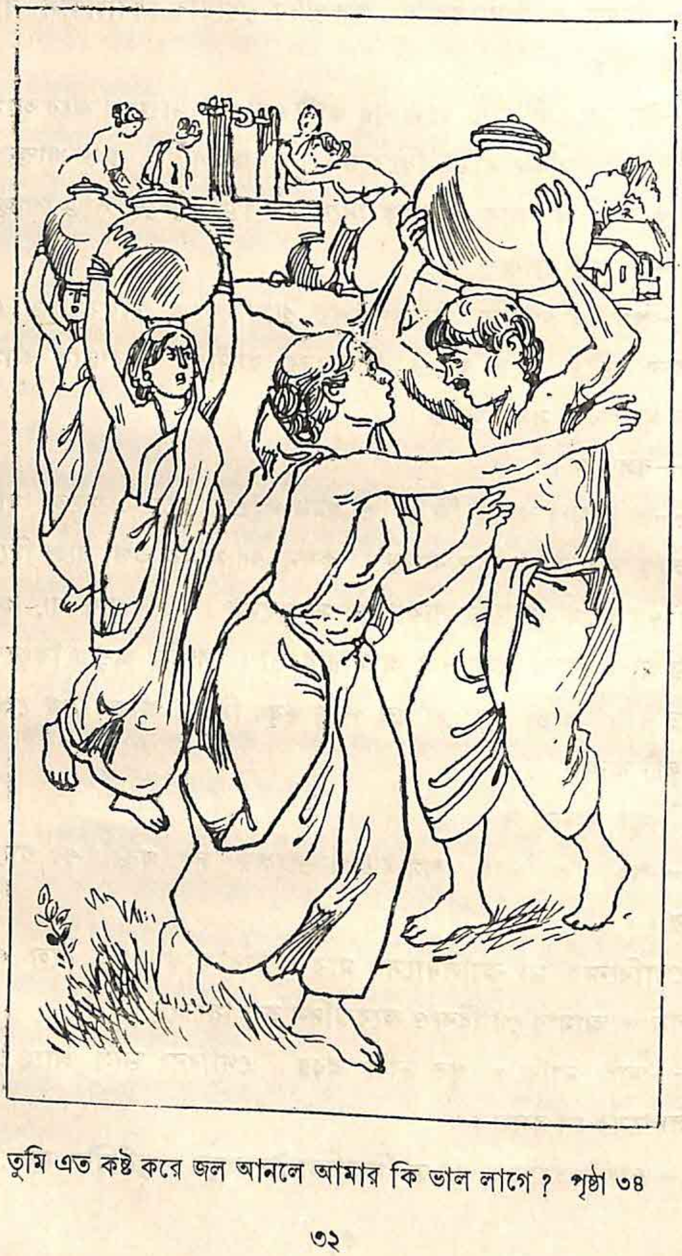
—খুব আশ্চর্য ত!

—শুধু কি তাই, স্বর্গ-মর্ত-পাতালের সব খবর ওর হাতের মুঠোয়।

গোবিন্দের মা কালিদাসের মার কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, —জান ত আমার গোবিন্দও কয়েকদিন হল ফিরেছে।

—তাই নাকি? খুব ভাল খবর। গোবিন্দ ভাল আছে ত? কালিদাসের মা বলল।

—ভালই আছে। ও ত গিয়েছিল ভৈরবপুর—পৃথিবীর সব চেয়ে



তুমি এত কষ্ট করে জল আনলে আমার কি ভাল লাগে ? পৃষ্ঠা ৩৪

বড় বীর ধুন্ধুমা সিংয়ের কাছে যুদ্ধ আর কুস্তি শিখতে। এখন বাড়ীতে এসেও সকাল বিকেল পাঁচশ করে ডন-বৈঠক লাগায়। আর যখন তাল ঠুকে তরোয়াল হাতে করে দাঁড়ায়, তার সামনে যায় কার সাধ্যি। বড় বড় বীর পালোয়ানেরাও গোবিন্দকে দেখলেই চোঁচা দৌড় লাগায়। স্বয়ং রাজা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন সৈন্যদলে কাজ দেবেন বলে।

কালিদাসের মা আর গোবিন্দের মা দুজনে গল্প করে যাচ্ছিল।

—কি গো বিষ্টুর মা, তুমি যে একেবারেই চুপ করে আছ? দুজনে একসঙ্গে বিষ্টুর মাকে জিজ্ঞাসা করে।

বিষ্টুর মা হাসে।

—তোমার বিষ্টু ভাল আছে ত? কালিদাসের মা জিজ্ঞাসা করে।

—তোমাদের আশীর্বাদে ভালই আছে।

—তা দেখ, তোমার ছেলেটাকে যদি লেখাপড়া শেখাতে চাও ভাল করে, তাহলে আমার কালিদাসের কাছে পাঠিয়ে দিও। কালিদাস দু'দিনে ওকে সব শিখিয়ে দেবে। তারপর গ্রামে হোক, শহরে হোক, কোথাও গিয়ে কাজ করে খেতে পারবে। তোমার আর কোন ভাবনা থাকবে না।

—তোমার কষ্টের কথা ত আমরা সবাই জানি বিষ্টুর মা। বিষ্টুর বাবা মারা গেল, তারপর থেকে কত কষ্টই ত করছ।

--দেখ, রোজগারের আরও রাস্তা আছে। ভাল করে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে পারলে রাজা সৈন্যদলে ভর্তি করে নেবেন। অনেক অনেক টাকাও পাবে। ও, ভাবছ বুঝি তরোয়াল চালাতে বর্শা ছুঁড়তে শিখবে কোথায়? আমার গোবিন্দ থাকতে তোমার চিন্তা কি? দু'দিনে ওস্তাদ করে দেবে। বুঝলে কিনা, আজই পাঠিয়ে দিতে পার।

বিষ্টুর মা বলল,—তোমরা খুব সত্যি কথাই বলেছ। বিষ্টুর বাবা যখন মারা গেল তখন আমার বিষ্টুর কি-বা বয়স। বড় জোর চোদ্দ। কত দুঃখ-কষ্টে সে দিনগুলো কেটেছে! তবে ছেলে আমার ঐ বয়স

থেকেই মায়ের সব কষ্ট বুঝত। চিঁড়ে-গুড় বেঁধে পাঠশালায় গেছে। পাঠশালা থেকে এসে আবার আমার কত কাজ করেছে।

—কিন্তু এখন কি করে বিষ্টু? গোবিন্দ ও কালিদাসের মা জিজ্ঞাসা করল।

—এখন ত বড় হয়েছে। পাঠশালার পড়াও শেষ হয়েছে। এখন আমাদের যা ছিটেফোঁটা জমি আছে তাই চাষ করে। মা-বেটার চলে যায়। তবে খুব খাটতে হয়। কিন্তু ছেলের বাড়ীতে এসেও ত শান্তি নেই।

কালিদাসের মা আর গোবিন্দের মা অবাক হয়ে বলল,—কেন? কেন?

—আমি বেশী কাজ করছি, কষ্ট করছি দেখলেই রাগ করে। তাই বাড়ী এসে কোথায় একটু আরাম করবে তা নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে।

—ওমা, এদিকে যে অন্ধকার হয়ে আসছে। এবার চল, জল নিয়ে বাড়ী যাই। বিকেলবেলা বাড়ী এসে আমাকে দেখতে না পেলে ছেলের আমার খুব রাগ হবে, কালিদাসের মা বলল।

—কোথায় গেছে কালিদাস? গোবিন্দের মা জিজ্ঞাসা করে।

—আরে, রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন নিজের ভাগ্য গণনার জন্যে।

—হ্যাঁ তাড়াতাড়ি চল, আমার গোবিন্দও রাজার সৈন্যদলে ভর্তি হতে গেছে। ফিরে এসে থালা ভর্তি খাবার তার চাই-ই। তা না হলে খুব রেগে যাবে।

তিনজনে মাথায় কলসী তুলে নেয়। বড় বড় কলসী নিয়ে চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তিনজনেরই।

ওরা রওনা হয়েছে মাত্র। হঠাৎ তারা দেখে, কালিদাস রাজবাড়ী থেকে গ্রামের দিকে আসছে। তাদের দেখে কালিদাস দাঁড়িয়ে পড়ল।

—বাঃ, বাঃ, রাস্তায় তিন-তিনটে জলভর্তি-কলসী। তাই তো সকাল থেকে আজ দিনটা ভালই যাচ্ছে। মা, তাড়াতাড়ি চল, রাজার কাছ থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। বলেই কালিদাস তিনটে জলভরা কলসীকে প্রণাম করে এগিয়ে যায়।

—ছেলে ত বলে গেল তাড়াতাড়ি বাড়ী এসো, কিন্তু এতবড় কলসী নিয়ে তাড়াতাড়ি চলা যায়, বল ? কি যে কষ্ট!

—মা, তুমি এখানে ? আমি রাজবাড়ী থেকে ফিরে এসে এদিকে ওদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। গোবিন্দ রাগ-রাগ মুখে বললে।

—বাড়ীতে খাবার জল ছিল না। তাই জল আনার জন্য আসতে হল। তা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস কেন ?

—বারে, সেই সাত সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। খিদে পাবে না ? তাড়াতাড়ি বাড়ী চল, খেতে দেবে।

—এতবড় ভারি কলসী নিয়ে কি তাড়াতাড়ি চলা যায় ?

—সে আমি কি জানি, আর একটু আগে এসে জল ভরে নিয়ে যেতে পারো নি। উঃ, কি খিদেই যে পেয়েছে! গোবিন্দ গজগজ করতে করতে চলে যায়।

গোবিন্দের মা আর কালিদাসের মা তাড়াতাড়ি চলতে থাকে আর হাঁপাতে থাকে। বিষ্টুর মাও ওদের পিছন পিছন আসে।

—মা, আবার তুমি বড় কুয়োতে জল নিতে এসেছ ? তোমাকে কত বারণ করি তবু তুমি কিছুতেই শুনবে না। বিষ্টু পিছন থেকে মার কাছে এসে বলে। ও যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে বিষ্টুর মা দেখতেই পায় নি।

—ঘরে যে একফোঁটা খাবার জল ছিল না বাবা। বিষ্টুর মা বলল।

—আমি হাটে যাবার আগে বললে না কেন, আমি এনে রেখে হাটে যেতাম।

—সারাদিন ত মাঠে কাজ করে, খেয়েদেয়েই আবার হাটে যাচ্ছিস, তোকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না বিষ্টু।

—মা, এখন কিন্তু তুমি আমাকে আরও বেশী কষ্ট দিচ্ছ। তুমি এত কষ্ট করে জল আনলে আমার কি ভাল লাগে? বলেই মার মাথা থেকে কলসীটা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে হন্‌হন্ করে হাঁটা দেয় বিষ্টু।

●



মুন্নি

সকাল হতেই মুন্নি উঠোনে দৌড়ে আসে। ঘুম-ঘুম চোখে পাখিটাকে চারদিকে খুঁজতে থাকে।

কদিন ধরেই পাখিটাকে মুন্নি খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় গেল? হঠাৎ দূর থেকে শিস শুনে সেই জানা গানটা শুনতে পায়। এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় গানটা লক্ষ্য করে।

ঐ ত অনেক দূরে ফুলিদের কুঁড়েঘরের সামনে বকুলগাছটায় বসে দোয়েল পাখিটা গান ধরেছে। মুন্নি একবার পিছন ফিরে তাকাল, তারপর একবার ঘরের খোলা দরজার দিকে। নাঃ, কেউ নেই। মা এখন কি করছে? মুন্নি জানে, মা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে কাজ করছে।

মুন্নি আর কোনদিকে তাকায় না, ছুটে চলে আসে ফুলিদের বাড়ীর কাছে বকুলগাছটার নীচে।

—আচ্ছা দোয়েল পাখি, তুমি আজকাল আমাদের বাড়ী আসো না কেন? গান শোনাও না কেন? জানো, বাবা তোমার কি সুন্দর নাম রেখেছে—তানসেন।

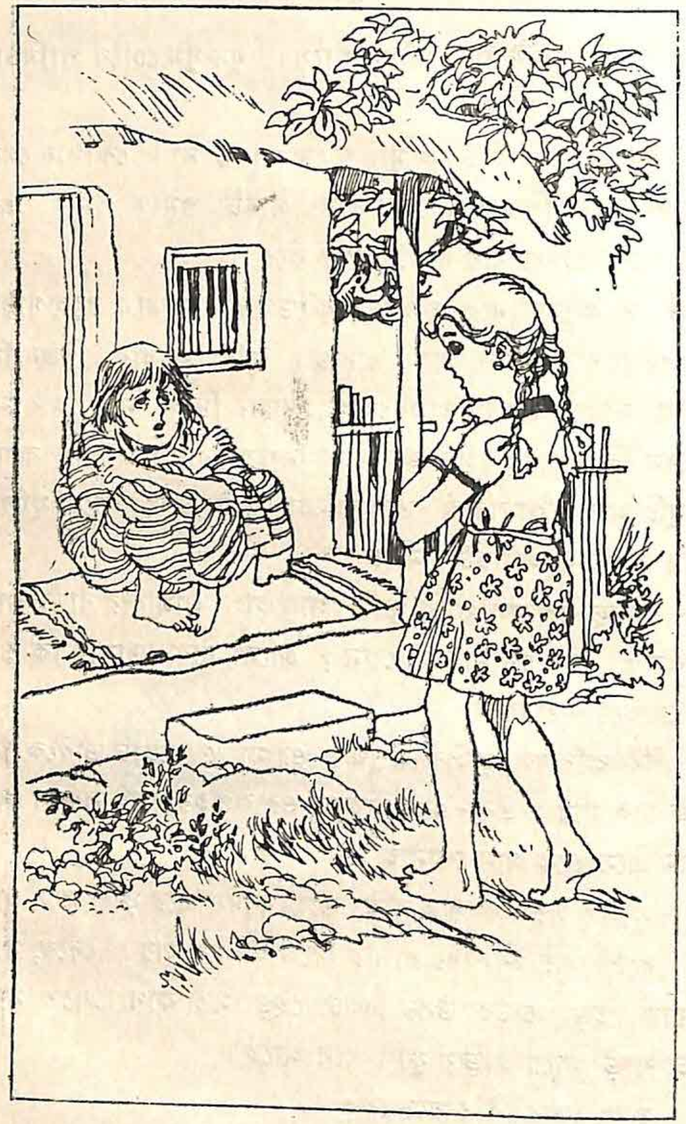
—কি করি বল, ফুলির অসুখ। ওর মা ওর ছোট ভাইকে নিয়ে কাজে চলে যায়। একা-একা থাকতে ওর কষ্ট হয়, তাই সকাল থেকে এখানে এসে ওকে গান শোনাই।

—ফুলির অসুখ করেছে বুঝি, তাই কদিন ধরে ফুলি স্কুলে যাচ্ছে না। বলেই মুন্নি ফুলিদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়। দেখে, মাটির দাওয়ায় ছেঁড়া চটের উপর একটা ছেঁড়া মত কাঁথা পেতে মায়ের একটা শাড়ী গায়ে জড়িয়ে ফুলি বসে আছে।

—ফুলি, তোর কি হয়েছে রে?

—আমার জ্বর হয়েছে।

—তোর মা কোথায়?



দেখে, মাটির দাওয়ায় ছেঁড়া চটের উপর ছেঁড়া মত কাঁথা পেতে মায়ের একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ফুলি বসে আছে। পৃষ্ঠা ৩৬

—মা বুঝি সকালে বাড়ী থাকে ? লোকের বাড়ী কাজ করতে হয় না।

—তোর যে জ্বর, তাও তোকে ফেলে চলে গেছে ? আমার কিন্তু জ্বরের সময় একা থাকতে ভারি কান্না পায়।

—কি করব, মা কাজে না গেলে লোকে মাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে। তখন খাব কি ? আমার ত বাবা নেই। কিছুদিন আগেই তিনি মারা গেছেন, জানিসই ত।

—তোর ছোট ভাইটা কোথায় ?

—মা আমার জ্বর দেখে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। কদিন ধরে মার ভারি কষ্ট হচ্ছে।

—কেন ?

—বারে, অন্যদিন আমিও ত মার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী-বাড়ী কাজ করি, বাসন মাজি, ঘর মুছি—মার একটু সুবিধা হয়। একটু তাড়াতাড়ি মার কাজ সারা হয়। তাছাড়া ভাইকেও ত আমি সামলাই।

—তবে তুই স্কুল যাস কি করে ?

—আমি ত সব কাজ করি না, কিছু কাজ করেই চলে আসি। তারপর স্কুল থেকে বাড়ী এসেও আবার মার সঙ্গে কাজ করি। মা অবশ্য খুব রাগ করে, স্কুল যেতে মানা করে, পড়তে মানা করে, কিন্তু স্কুলে না গেলে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

—তুই এত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিস কেন ?

—কি করব খুব শীত করছে যে।

—জামা পরিস নি ?

—না, তোর দেওয়া একটা মাত্র জামা, সেটা মা কাল সন্ধ্যেবেলা কেচে দিয়েছে, এখনও শুকোয়নি। তাছাড়া ঐ একটা মাত্র জামা, ওটা ছিঁড়ে গেলে স্কুলে কি পরে যাব ?

—আচ্ছা দাঁড়া, বাড়ী থেকে তোর জন্যে আর-একটা জামা নিয়ে আসি।

—না,-না, তোর মা তোকে বকবে, দরকার নেই, তুই যাস না।

—দেখ না, বলেই মুন্নি বাড়ীর দিকে দৌড় লাগায়।

বাড়ী ঢুকেই মুন্নি তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ফ্রক তুলে নিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়ায়। একটু এদিক ওদিক তাকায়।

—এই সক্কালবেলা কোথায় যাচ্ছ মুন্নি? হাতে ওটা কি? মা যে কখন মুন্নির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মুন্নি তা দেখতেই পায়নি।

মুন্নি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—হাতের ঐ ফ্রকটা নিশ্চয়ই ফুলিকে দিতে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ মা, ফুলিকে ওটা দেব।

—এই ত সেদিন একটা দিয়েছ, রোজ রোজ দিতে হবে না।

—মা, ওর একটা মাত্র জামা, কাচলে পরবে কি? নোংরা জামা গায়ে দিয়ে যায় বলে স্কুলে মাঝে মাঝেই খুব বকুনি খায় ও।

—স্কুলে! ও আবার স্কুলে যায় নাকি? ও ত ওর মার সঙ্গে বাড়ী-বাড়ী বাসন মাজে।

—হ্যাঁ মা, বাসনও মাজে, স্কুলেও যায়। মনে নেই, তুমি যখন আমাকে অ, আ, ক, খ শেখাতে, ও তখন একটু দূরে চুপ করে বসে থাকত। ওর মা ওকে কত বকত। ফুলি সব শুনে শুনেই শিখে নেয়, খুব বুদ্ধি ওর।

—পড়াশুনো করে, স্কুলে যায়, আবার মার সঙ্গে ঝিয়ের কাজও করে। সত্যি সত্যি ও পড়াশুনো করে? অবাক হয়ে মুন্নির মা প্রশ্ন করেন।

—মা, ফুলি পড়াশুনোয় খুব ভাল। স্কুলের দিদিমণিরা বলেন, ফুলি, তুমি একটু ভাল করে পড়াশুনো কর, তাহলে ক্লাশের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী হবে তুমি। কিন্তু ওকে ত ওর মার সঙ্গে কাজ করতে হয়, কখন পড়বে? তাছাড়া বই-ই নেই ওর। মা, তুমি বকো না, আমি ওকে এ জামাটা দিয়ে আসি। ওর জ্বর হয়েছে, খালি গায়ে ও ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে।

—না, জামা-টামা দেওয়া হবে না। আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। মুন্নির মা রাগ-রাগ মুখ করে মুন্নির হাত থেকে জামাটা নিয়ে চলে যান।

মুন্নি এক-পা, এক-পা করে বাইরে চলে আসে। হাঁটতে থাকে, কোথায় যাচ্ছে জানে না। তবে ফুলিদের বাড়ী নয়। কিছুই ভাল লাগে না ওর। মা কেন শুধুশুধু বকল? বড়রা এমন হয় কেন? মুন্নি ভেবেই পায় না। ওর কান্না পেতে থাকে।

নদীর ধারে এসে চুপ করে বসে থাকে মুন্নি। ছোট্ট নদী, গরমের দিনে পায়ের পাতা ডোবে শুধু। মুন্নি পা ডুবিয়ে কতদিন হেঁটে নদীর এপার-ওপার করেছে। আজ কিন্তু ওর কিছু ইচ্ছে করে না। হঠাৎ শুনতে পায়, দোয়েল পাখিটা কাছেই কোথাও গাছের ডালে বসে ডাকছে।

—ও দোয়েল পাখি, দোয়েল পাখি, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে, মুন্নি বলে।

—কি কাজ? বলেই দোয়েল পাখিটা মুন্নির পাশে এসে বসে।

—আমার গায়ের এই জামাটা তুমি ফুলিকে দিয়ে আসবে?

—আর তুমি খালি গায়ে থাকবে?

—তাতে কি হয়েছে, আমার ত জ্বর হয়নি। খালি গায়ে থাকলে কিছু হবে না। কিন্তু ফুলির জ্বর, খালি গায়ে খুব কষ্ট হচ্ছে। ওকে জামাটা দিয়ে এসো না, তুমি খুব লক্ষ্মী দোয়েল পাখি।

—আমি ত ছোট্ট পাখি, এতবড় জামা নিয়ে যাব কি করে? দাঁড়াও। একটু চিন্তা করে দোয়েল বলে—আমি আমাদের দোয়েল-রানীকে ডেকে আনি। রানী এসে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন। বলেই দোয়েল উড়ে গেল…ফুড়ুৎ।

কিছুক্ষণ পর…

—মুন্নি, মুন্নি, দেখ, দেখ কে এসেছে।

দোয়েল পাখির ডাকে মুন্নি ফিরে দেখে অনেক, অনেক দোয়েল পাখি ওকে ঘিরে রয়েছে। আর ঐ দোয়েল পাখির মেলায় একটি সুন্দর বড় মত দোয়েল পাখি। মাথায় তার মুকুট, আর পায়ে নূপুর বাঁধা। গানের সুরে নূপুর বাজিয়ে রানী-পাখি বললে—মুন্নি, কি হয়েছে গো, এত মন খারাপ কেন তোমার ?

—মন খারাপ হবে না। আমার বন্ধু ফুলির অসুখ, তার ওপর মা আমাকে শুধুশুধু বকেছে। আচ্ছা দোয়েল-রানী, আমার এই জামাটা ফুলিকে পৌঁছে দেবে ?

—দেব, এখনই তার ব্যবস্থা হবে। দোয়েল-রানী সব দোয়েল পাখিদের দিকে তাকিয়ে বললে—যাও ত তোমরা, বেশ কয়েকজন মিলে মুন্নির জামাটা ফুলিকে দিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ আমাদের দেশটা মুন্নিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

মুন্নি বলল—কোথায় তোমার রাজ্য, দোয়েল-রানী ?

—ঐ যে দূরে অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, ঐখানে আমরা থাকি।

—অতদূর যেতে যে অনেকখানি হাঁটতে হবে গো।

—তোমার কিচ্ছুটি করতে হবে না। তুমি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখ না। এই না বলে দোয়েল-রানী নিজের পাখা খুলে মুন্নির সারা গায়ে বুলিয়ে দিলে।

ওমা, কি সুন্দর পাখা! মুন্নি সারা গায়ে রামধনু রঙের পাখা দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

দোয়েল-রানীর সঙ্গে মুন্নিও উড়তে থাকে। একটু পরেই সে দোয়েল-রানীর সঙ্গে পৌঁছে যায় গাছগুলোর কাছে। কতরকমের বড় বড় গাছ····সব গাছের নাম ত মুন্নি জানে না। প্রত্যেক গাছেই দোয়েল পাখিদের একই ধরনের ছোট ছোট বাড়ী। মুন্নি হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—বাঃ, বাঃ, তোমাদের সবার বাড়ীগুলো কি সুন্দর এক-রকমের! ভারী মজার ত!

দোয়েল-রানী বলল—আমরা সবাই একরকম বাড়ীতেই থাকি। আর দেখছ না, একই রকম পোশাক পরি। আমরা সবাই একই ধরনের গান গাই, আর সবাই আমরা একই ধরনের খাবারও খাই।

মুন্নি বলে—তুমি ত রানী, তুমিও খাও?

—হ্যাঁ গো মুন্নিদিদি, আমিও। শুধু কেউ কারুর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি যাতে না করে সেটুকু দেখাশোনা করার জন্যেই আমি রানী। এখন চল, দোয়েলগুলো তোমার জামাটা ফুলিকে দিয়ে এল কিনা গিয়ে দেখি।

—চল, চল দোয়েল-রানী, ফুলির জন্য আমারও খুব মন খারাপ করছে।

বেলা বারোটা বাজে, মুন্নির না-হয়েছে খাওয়া, না হয়েছে স্নান। সেই সাত-সকালে মেয়ে পাড়া বেড়াতে বের হয়েছে, এখনও বাড়ী ফেরার নাম নেই। মুন্নির মা রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে আশেপাশে সব বাড়ীতেই মুন্নির খোঁজ করতে থাকেন মায় ফুলিদের বাড়ীতেও।

এমন সময় কমলি এসে হাজির মুন্নিদের বাড়ী। নদীর ধারে মাঠে রোজ গরু চরাতে যায় কমলি। মুন্নির মাকে ডেকে বলে—তোমাদের মেয়ে মুন্নি না নদীর ধারে বালিতে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। কত ডাকলাম উঠলই না।

কমলির কথা শুনে মুন্নির বাবা, মা, দাদা, আর মুন্নির ছোট্ট কুকুর ভুলো সব্বাই নদীর ধারে গিয়ে হাজির। দেখে কি, ঐ কটকটে রোদে মুন্নি খালি গায়ে বালির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর গায়ের ফ্রকটা দূরে পড়ে আছে, আর কতগুলো দোয়েল পাখি ফ্রকটাকে ঠোকরাচ্ছে।

—মুন্নি, ও মুন্নি! মুন্নির মা মুন্নিকে জোরে জোরে ডাকেন।

—দোয়েল-রানী, পাখিরা আমার জামাটা ফুলিকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে ত? ফুলির জ্বর, বড় কষ্ট ওর। ঘুম-ঘুম গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে মুন্নি বলে।

—এই মুন্নি, কি সব বলছিস ? ভাল করে তাকিয়ে দেখ। বলতে বলতে মুন্নির মা মুন্নিকে কোলে তুলে নেন।

তারপর কমলির দিকে চেয়ে বলেন—যা ত কমলি, মুন্নির এই জামাটা ফুলিকে দিয়ে আয় ত মা। আর বলবি, মুন্নিদিদি বলেছে, যদি বিকেলে জ্বর না থাকে তবে যেন এই জামাটা গায়ে দিয়ে একবার আমাদের বাড়ী নিশ্চয়ই আসে।

●

আকাশে মিষ্টি জল

মস্ত এক পাখি। পাখি ত নয়, যেন বড় এক উড়ো-জাহাজ। পাখিটা শুধু মস্ত নয়, দেখতেও বিচ্ছিরি। গায়ে কালো আর ছাই-ছাই রং। মাটি-রঙের ঠোঁট। ঠ্যাং দুটো কাদার উপর হেঁটে-হেঁটে কাদা রং ধরে গেছে। তার উপর আবার ফাটা-ফাটা এবড়ো-খেবড়ো। থাকে একটা লম্বা নারকেল গাছের মাথায়। দেখতে বিচ্ছিরি হলে কি হবে, পাখিটা কিন্তু খুব শৌখিন। গাছের মাথায় লম্বা-লম্বা পাতা-গুলোকে গুছিয়ে-টুছিয়ে লতা দিয়ে জড়িয়ে সে একটা সুন্দর বাসা বানিয়েছে। জোনাকি পোকা এনে গুঁজে রেখেছে ঘরের ভিতর, রাতে তার ঘর আলোয় আলো। কিন্তু পাখির মনে সুখ নেই। তার সঙ্গে কারুর বন্ধুত্ব হয় না। যে দেখে সেই ভয় পায়। যদি কথা বলতে একটু এগিয়ে যায় কারুর কাছে, সে তখনই ছুট্‌···ছুট্‌। কেউ তার বাসায় আসে না। তাই সব সময় তার মন খারাপ।

একদিন হয়েছে কি, পাখি নদী থেকে একটা বড় মাছ ধরে বসে বসে আরাম করে খাচ্ছে। এমন সময় খুব সুন্দরী একটা মেয়ে কলসী নিয়ে এল নদী থেকে জল নিতে। পাখি এমন সুন্দরী মেয়ে কোনদিন দেখেনি। কোথায় রইল খাওয়া-দাওয়া। সব ভুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল মেয়েটার দিকে। চাঁপাফুলের মত গায়ের রং, কালো লম্বা-লম্বা মাটিছোঁয়া চুল। পাখি এক-পা, এক-পা করে মেয়েটার দিকে এগিয়ে যায়।

কলসীতে জল ভরে মেয়ে উপরে উঠে আসছিল। ঐ মস্ত বিচ্ছিরি পাখিটাকে দেখে 'বাবাগো' 'মাগো' বলে যেই ছুটতে যাবে, হাত থেকে কলসী পড়ে টুকরো-টুকরো। আর এই সুযোগে মেয়েটাকে টুক্‌ করে ঠোঁটে তুলে নিল পাখি। তারপর উড়তে উড়তে চলে এল লম্বা গাছের মাথায় নিজের বাসায়।

বাসায় মেয়েটাকে নামিয়ে পাখি বলল—দেখ, আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে খুব সুখে রাখব। দেখছ ত, কি সুন্দর আমার বাসা। তোমায় কোন কাজ করতে হবে না। তুমি এখানে শুধু খাবে-দাবে আর আমার সঙ্গে গল্প করবে। কোন কষ্ট হবে না তোমার।

কিন্তু মেয়ে কোন কথাই বলে না, শুধু কাঁদে।

পাখি বলে—তুমি কাঁদছ কেন গো ? আচ্ছা, তোমার নাম কি ?

কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে বলে—আমার নাম রানী। কিন্তু তুমি আমাকে ধরে নিয়ে এলে কেন ? আমি বাড়ী যাব। আমার ছোট ভাই আমাকে এতক্ষণ না দেখে নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে।

—কেন, তোমার বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

—না, আমার মা অনেকদিন আগেই মরে গেছে। আমরা খুব গরিব। বাবা রোজ সকালে নদীতে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরে বিক্রি করে সন্ধেবেলা বাড়ী ফেরে, কাঁদতে কাঁদতে রানী বলে।

—তুমিই বাড়ীর সব কাজ কর বুঝি ?

—হ্যাঁ, আমিই সব করি, নৈলে কে করবে। ভাইকে দেখি, সন্ধেবেলা বাবা ফিরে এলে ভাত রান্না করি, মেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে। আমাকে গাছ থেকে নামিয়ে দাও পাখি, আমি বাড়ী যাব।

—আচ্ছা রানী, আমি যদি তোমার বাবাকে অনেক, অনেক টাকা এনে দি, তাহলে ত তোমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। আর তুমিও নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে।

—হ্যাঁ, হবই ত। তোমার বুঝি অনেক টাকা আছে, পাখি ?

—আমার কাছে নেই। তবে অনেক টাকা আছে এমন একটা জায়গা আমার জানা আছে।

—তুমি আমার বাবাকে তাহলে সে জায়গাটা দেখিয়ে দাও, রানী কান্না থামিয়ে বলে, অনেক টাকা পেলে আমার বাবা আর ছোটভাই খুব আরামে থাকবে।

—দেব, তবে একটা শর্ত আছে।

—কি শর্ত ?

—তোমাকে আমার কাছে থাকতে হবে। রাজি ?

রানী চুপ করে থাকে। কি বিচ্ছিরি দেখতে পাখিটা, এটার সঙ্গে থাকতে হবে ? ভাবতেই ওর গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। কিন্তু বাবা, ভাই আরামে থাকবে।

—কি, কথা বলছ না যে ?

—আমি রাজি।

—চল, তোমাকে নদীর ধারে একটা গাছের বিরাট বড় ফোকর দেখিয়ে দেব। পরশু সন্ধেবেলা ডাকাতেরা সেখানে অনেক টাকা, গয়না, মণিমুক্তো লুকিয়ে রেখে গেছে। তুমি তা নিয়ে তোমার বাবাকে দিয়ে আমি যা বললাম সব কথা বলবে। একমাস পর এই গাছের নীচে এসে দাঁড়াবে, আমি তোমাকে ওপরে তুলে নেব।

পাখি রানীকে সেই গাছের কাছে নিয়ে যায়। তারপর ইট পাথর সরিয়ে, লতাপাতা ছিঁড়ে রানীকে গাছের ফোকরে টাকা-পয়সা দেখিয়ে দেয়। রানী ত অবাক! এত কলসী-কলসী টাকা সে গুণেও শেষ করতে পারবে না। আর সোনাদানা মণিমুক্তো দেখে ত রানীর চোখ ঝলসে যায়। রানী পাখিকে বলে—এত টাকা-গয়না আমি একা বাড়ী নিয়ে যাব কি করে ?

পাখি বলে—তুমি বাড়ী যাও। রাতের অন্ধকারে আমি সব তোমাদের বাড়ী পৌঁছে দেব। কিন্তু মনে থাকে যেন, একমাস পর তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

রানী বাড়ী এসে দেখে তার বাবা ফিরে এসেছে, ভাই কাঁদছে তার জন্য। রানীকে দেখে তার বাবা বলে—হ্যাঁরে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? কখন ভাত রাঁধবি ?

ভাই বলে—দিদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

রানী তার বাবাকে সব কথা বলে। হঠাৎ বাইরে খুটখাট্ শব্দ। রানী ও তার বাবা বাইরে এসে দেখে, তাদের কুঁড়েঘরের দরজায় ঘড়া-ঘড়া টাকা, মণি-মাণিক্যের স্তূপ।

জেলে ত মহা খুশি। তার এখন অনেক টাকা। পরের দিনই সে মস্ত বাড়ী তৈরী করল। মাছ ধরা আর বিক্রির জন্য কিনল বড় বড় নৌকা, জাহাজ আরও কত কি! কত লোক এখন তাদের বাড়ী কাজ করে। কেউ রাঁধছে, কেউ বাটনা বাটছে, কেউ ঘরদোর পরিষ্কার করছে। রানীকে এখন কিছুই করতে হয় না। রানীর ভাই পাঠশালাতে রোজ পড়তে যায়। মহা আনন্দে দিন কাটছে। পাখির কথা সবাই ভুলে গেছে···রানীও।

সেদিন সকালে উঠে বাইরে বেরিয়েই রানী দেখে, পাখি দরজায় দাঁড়িয়ে। রানীর মনে পড়ে যায়, অনেক আগেই তার গাছের নীচে যাবার কথা। রানী কিছু বলার আগেই পাখি ওকে তুলে গাছের বাসাতে নিয়ে চলে আসে।

পাখি রানীকে বলে—তুমি তোমার কথা কিন্তু রাখনি।

রানী ভয়ে কোন উত্তর দেয় না। পাখিকে দেখে ওর শুধু ঘেন্নাই করে না, রাগও হয়। রাগ করে রানী একদিন খায় না। তাছাড়া রানী খাবে কি? পাখি আনে কাঁচা মাছ-মাংস। সে সব পাখি খায়। সে কি করে কাঁচা মাছ-মাংস খাবে?

—রানী, কদিন উপোস করে থাকবে? পাখি বলে।

—আমি কাঁচা মাছ-মাংস খেতে পারি না। রাগ-রাগ মুখে রানী বলে।

—আচ্ছা, এবার তোমার জন্যে এমন সব খাবার আনব তা তুমি নিশ্চয়ই খাবে।

পাখি রানীর জন্য আম, জাম, লিচু, কলা, পেয়ারা নানান ফল নিয়ে আসে। রানীকে আর উপোস করে থাকতে হয় না। পেট ভরে

ফল খায়। কিন্তু জল? রানী পাখিকে বলে—আমাকে জল এনে দাও। জল না খেলে আমি মরে যাব যে!

পাখি মহা মুশকিলে পড়ে। জল কোথায় পাবে? জলের জন্য রানী কাঁদছে। দেখে পাখির কষ্ট হয়। কিন্তু পাখি ভাল করেই জানে, নদীর ধারে রানীকে ছেড়ে দিলেই রানী পালিয়ে যাবে। পাখি খুব ভাল করেই বোঝে, রানী তাকে ভীষণ ঘেন্না করে। শুধু ভয়ে চুপ করে থাকে, একদম ভালবাসে না।

যদি ও আমাকে একটু ভালবাসত, পাখি ভাবে—তাহলে আমার কোন কষ্ট থাকত না। ওকে জলের জন্য নদীর ধারে আমি নিয়ে যেতাম। তাছাড়া যেতাম আরও কত নতুন দেশে বেড়াতে। পাখি চুপ করে বসে থাকে।

—আমাকে জল এনে দাও। আমার গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আমি কষ্টে মরে যাচ্ছি। আমাকে জল দাও। পাখি রানীর কষ্ট আর সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে গাছের মাথায় এসে বসে।

—তবে কি রানীকে ছেড়ে দেব? কিন্তু বাসায় রানী নেই এটা পাখি ভাবতেই পারে না।

হঠাৎ নারকেল গাছটা বলে ওঠে,—পাখি, আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছি। তুমি রানীকে নদীর ধারে নিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছ, আবার রানী যে তেষ্টায় জলের জন্য কাঁদছে তাও সহ্য করতে পারছ না।

—কি যে করি ভেবেই পাচ্ছি না ভাই।

—তোমাকে আমি জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, কিন্তু তোমায় খুব কষ্ট করতে হবে।

—রানী যদি জল খেতে পায়, আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি।

—সব কষ্ট সহ্য করবে? আচ্ছা, তুমি একটা বড় কাঁটা নিয়ে এস। আর সেই কাঁটাটা খুব জোরে তোমার বুকে বিঁধিয়ে দাও।

তোমার বুক থেকে ফোঁটা ফোঁটা যে লাল রক্ত ঝরবে, তুমি সেই রক্ত ঝরতে দাও আমার গাছের ফলগুলোর ওপর। যত ফোঁটা রক্ত ঝরবে তোমার বুক থেকে, তত ফোঁটা সুন্দর পরিষ্কার জল জমবে ফলের ভেতর। বুঝেছ, পারবে?

—পারব। পাখি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে নিয়ে আসে মস্ত একটা ধারাল বাবলা গাছের কাঁটা। ঠিক ফলগুলোর উপর একটা ডালে বসে ধীরে ধীরে চেপে ধরে কাঁটাটা বুকের উপর। উঃ, কি ভীষণ ব্যথা। রানীর মুখটা পাখি ভাবতে থাকে। তার জল চাই-ই চাই।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর ঝরঝর করে পড়তে থাকে রক্ত। সবুজ ফলের উপর রক্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত শুষে নেয় ফল। কিছুক্ষণ পর পাখি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

গাছ বলে,—পাখি শুনছ, এই তিনটে ফলে জল ভরে গেছে। তুমি তোমার লম্বা ঠোঁট দিয়ে ফলটা ছেঁদা করে রানীকে দাও। এই ফলের জল খেয়ে রানীর তেষ্টা মিটে যাবে। রানী খুব খুশি হবে।

পাখি ঠোঁটে করে একটা বড় সবুজ ফল নিয়ে আসে, ফুটো করে রানীকে দেয়। বলে,—রানী দেখ কি সুন্দর জল তোমার জন্য এনেছি।

রানী প্রথমটা বিশ্বাস করে না। তবু পাখির কথায় ফলটা নেয়। আরে, আরে, তাই ত! কি মিষ্টি জল ফলের ভিতর! সবটা খেয়ে রানী বলে,—আর আছে?

পাখি আর একটা ফল এনে রানীকে দেয়। রানী দুটো ফলের জলই খেয়ে ফেলে।

রানীর এখন পাখির বাসা ভালই লাগে। সে বেশ মজা করে নানারকম ফল খায়। তেষ্টা পেলেই পাখি তাকে নারকেল গাছের সবুজ ফল এনে দেয়। রাতে কচি পাতার বিছানায় ঘুমোয়। তাছাড়া পাখি রোজ তাকে তার বাবা আর ভাইয়ের খবর এনে দেয়।

সে কিন্তু জানে না তার জন্য পাখি কত কষ্ট করে। সারারাত



রানীর পাখিটার জন্য কষ্ট হয়। ও পাখির গায়ে হাত দেয়। পৃষ্ঠা ৫২

একটার পর একটা ফলে পাখি নিজের বুকের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে ফলগুলোতে জল ভরে রাখে। রানী এ ফলের জল খেতে ভালবাসে, পাখির তাতেই আনন্দ।

সেদিন সকালবেলা রানী উঠে দেখে, পাখি ঘরের এককোণে চুপ করে বসে আছে। চোখ তার বন্ধ। রানী পাখির কাছে গিয়ে বলে,—পাখি, ও পাখি, কি হল তোমার? এমন চুপ করে বসে আছ কেন? বেড়াতে যাবে না? আমার জন্য খাবার আনবে না?

পাখি চোখ খোলে, আবার চোখ বন্ধ করে নেয়। এত কষ্ট হচ্ছে তার যে, ভাল করে নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। তবু অনেক কষ্টে বলে,—নারকেল গাছ বলেছে, যে ফলগুলো পেকে গেছে তাতে শুধু জল নয়, মিষ্টি শাঁসও থাকবে। তোমার খাবার হয়ে যাবে।

—শুধু কি আমার খাবার দরকার, তোমারও ত খাবার চাই।

—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কি হয়েছে তোমার? অসুখ করেছে? রানীর আজ এই বিচ্ছিরি বিকট পাখিটার জন্য কষ্ট হয়। ও পাখির গায়ে হাত দেয়, আজ আর ওর ভয় করে না, ঘেন্না করে না।

—রানী, এই যে নারকেল গাছ, যাতে আমার বাসা, এ গাছে ফল ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে না ছিল মিষ্টি জল, না ছিল মিষ্টি শাঁস। তোমার তেষ্টা মেটাবার জন্য আমি রোজ একটা বড় কাঁটা বুকে বিঁধিয়ে দিয়েছি খুব জোরে, রক্ত ঝরে পড়েছে ফলের ওপর, আর সেই রক্ত শুষে নিয়েছে ফলগুলোও। তাতেই সুন্দর মিষ্টি জল আর মিষ্টি শাঁস তৈরী হয়েছে ফলের ভেতর। কিন্তু রোজ রাতে রক্ত দিয়ে দিয়ে আমার সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে।

রানী পাখির কথা শুনে কেঁদে ওঠে,—পাখি, এ তুমি কি করেছ? তুমি যে মরে যাবে।

পাখি বলে,—রানী, ভয় পেও না। গাছ বলেছে, আজ তিন রাত ধরে আমার বুকের রক্ত যে ফলগুলোতে দিয়েছি, তার ছোঁয়া লেগে সব

ফলেই জল আর শাঁস পাওয়া যাবে। আমার বন্ধু নারকেল গাছ তার নিজের বংশের সব গাছকেই আমার কথা বলে দিয়েছে। তাই রানী, আমি মরে গেলেও তোমার কোন কষ্ট হবে না।

রানী কাঁদতে কাঁদতে একহাতে পাখির গলা জড়িয়ে ধরে অন্য হাতটা পাখির সারা গায়ে বুলিয়ে দেয়,—আমি তোমাকে কখনও মরতে দেব না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, পাখি।

ওমা, কোথায় সেই বিচ্ছিরি পাখিটা, এখন কেমন একটা সুন্দর মানুষ রানীর সামনে দাঁড়িয়ে।

মানুষটি বলল,—রানী, আমি এদেশের রাজার ছেলে। দেখতে ছিলাম খুব সুন্দর। আশেপাশের ছোট-বড় ধনী-গরীব সবাই আমাকে খুব ভালবাসত। কিন্তু আমার ছিল বেজায় অহঙ্কার, কাউকে ভালবাসতাম না। শুধু নিজেকেই ভালবাসতাম।

একদিন হয়েছে কি, আমি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমাদের বাগানের মালীর ছোট্ট মেয়েটা আমাকে দেখে গুটিগুটি এগিয়ে এল আমার কাছে। আমাকে দেখে কি খুশি। হাতে একটা সুন্দর গোলাপ ফুল। বাগানের সেরা গোলাপ। কাছে এসে আমার হাতে দিতেই আমি ভীষণ রেগে একটা চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে। কি, এত সাহস গরিব মালীর একটা কালো কুচ্ছিত মেয়ের, আমার মত সুন্দর রাজপুত্রের হাতে ফুল দেওয়া! ঘেন্নায় ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতো করে দিলাম ফুলটা। মেয়েটা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, তাকিয়েও দেখলাম না।

বাগানটা পার হয়ে চলে আসছি, দেখি, দেশের সবচেয়ে বড় জাদুকর সামনে দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে রাগে ফুঁসছে। আমাকে দেখেই বলল,—তুই একটা বিচ্ছিরি বিকট বড় পাখি হয়ে যা। কেউ তোকে ভালবাসবে না। ভয় করবে, ঘেন্না করবে। যেদিন সত্যি সত্যি ভালবাসতে শিখবি, কারুর জন্য কষ্ট করতে পারবি,

সেদিন থেকেই সবাই তোকে ভালবাসবে। তুই আবার মানুষ হতে পারবি।

রানী বললে,—আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

—আমিও, নারকেল গাছ বলে।



কুচুটে বাদুড়

সাত সমুদ্দুরের পাড়ে এক বিশাল বন…

—আমাদের একজন রাজা চাই, রাজা। উড়ুক্কু মাছগুলো সমুদ্র থেকে উঠে এসে জঙ্গলের প্রাণীদের খবর দিল।

—আমরাও ত সেই কথাই ভাবছি। কিন্তু কাকে রাজা করা যায়? ঝামুরঝুমুর ভাল্লুক তার গম্ভীর মুখে হাত দিয়ে বলল।

হঠাৎ মাথার উপর ক্র—র্—র্—কঃ।

—কি ব্যাপার? কি ব্যাপার কুচ্‌কুচে কাক? উড়ুক্কু মাছগুলো পাখা নেড়ে নেড়ে প্রশ্ন করে।

—আমি একটা খবর দিতে এলাম। আমরা, সব পাখিরা বেজায় ভাবনায় পড়ে গেছি।

—কেন? কেন? দৌড়তে দৌড়তে টাইটাং নেকড়েটা দাঁড়িয়ে পড়ে কাকের কথা শুনে।

—আরে, আমাদের একজন রাজা চাই যে, তা না হলে কেউ কারুকে মানছে না। যতরকম শয়তানি করছে।

ঝামুরঝুমুর ভাল্লুক বলল,—কিরকম?

কুচ্‌কুচে কাক বলল,—আর বল কেন, কোকিলের মত কুঁড়ে আর ফাঁকিবাজ পাখি দুটো নেই সে ত জানই। ঘরদোর তৈরী করবে না ঠিক সময়, নিজের ডিমগুলো রেখে আসবে আমার ঘরে। আমার স্বভাব ত জানই, আমি ওর ডিমগুলো ফেলতে পারি না। কত যত্নে ওর ডিম থেকে ছানা বার করি। ছানাগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করি। কিন্তু কোকিলের কাণ্ড দেখ, ছানাগুলো যেই একটু বড় হল কি না হল, অমনি বলা নেই কওয়া নেই ওদের নিয়ে পগার পার। বল ত কার না রাগ হয়।

—রাগ ত হবার কথাই, গাছ থেকে ধুপ করে নেমে এসে সবার সামনে বসল হুপহাপ বীর হনুমান।

—কিন্তু কিছু বলার কি উপায় আছে? সেদিন ওর বাচ্চা-গুলোকে চুরি করে নিয়ে যাওয়াতে যেই বললাম,—কা····কা, এটা খুব অন্যায় কাজ। ও ছুটে দূরে গাছের ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে মুখ ভেংচে বলল,—কু···কু। কুচ্‌কুচে কালো কুটকুটে পাখি, যেন ও খুব ফরসা। তোমরাই বল, এসব অন্যায় কিনা?

হুপহাপ হনুমান গম্ভীর হয়ে সব শুনে সপাং করে লেজ আছড়ে বলল,—ঠিক কথা।

—তাই আমাদের একজন রাজা চাই-ই। আমি সব পাখিদের মত নিয়ে এসেছি। এখন একটা দিন ঠিক কর, যেদিন সব মাছ, পাখি আর পশুদের মত নিয়ে একজন রাজা ঠিক করতে হবে।

—ঠিক কথা, কুচ্‌কুচে কাক ঠিক বলেছে। ঝামুরঝুমুর ভাল্লুক বলে।

—তাহলে আগামীকালই তুপুরে এইখানেই আমরা সবাই আমাদের রাজা ঠিক করব। তা মাছেরা, তোমরা সবাই সমুদ্রের ধারে এসে হাজির হয়ে যেও। পাখিরাও সবাই আসবে, আর আমরা ত থাকবই, টাইটাং নেকড়ে বলল।

খবর নিয়ে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক ছুটল সমুদ্রে, কুচ্‌কুচে কাক উড়ল আকাশে।

পরদিন ঠিক তুপুরবেলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় মাছেরা সব হাজির—তিমি, হাঙ্গর, শুশুক, শঙ্করমাছ, তরোয়াল মাছ, ছোটবড় কত যে মাছ তার ঠিক নেই।

সমুদ্রের ধারে জঙ্গলে গাছের নীচে হাতী, সিংহ, বাঘ, চিতা, বাঁদর, ভেড়া, হরিণ, গরু, শিয়াল, ছাগল, বেড়াল, কুকুর, উট, নেকড়ে, ভাল্লুক, আরও কত কি।

গহীন বনের গাছের ডালে ডালে পাখির ঝাঁক—দোয়েল, ফিঙে, ময়ূর, তোতা, ময়না, চিল, বাজ, কোকিল, শালিক, শকুন, চড়ুই, কত কত পাখি।

পশুদের হাঁক-ডাকে, পাখীদের কিচির-মিচিরে চারদিক সরগরম্। তার উপর জলে মাছদের ঝাঁপাঝাঁপি ত আছেই।

এমন সময় বাঘমশাই প্রচণ্ড জোরে হাঁক দিল, —সবাই চুপ কর। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। পাখিরা চুপ, জন্তুজানোয়ার চুপ, মাছেদের ঝাঁপাঝাঁপি বন্ধ।

ঝামুরঝুমুর ভাল্লুক উঠে দাঁড়াল, বলল,—বন্ধুরা, জলের বন্ধু, স্থলের বন্ধু, আকাশের বন্ধুরা সবাই শোন, আমাদের একজন রাজা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের সবাইকে খুব ভেবে চিন্তে রাজা ঠিক করতে হবে। শক্তিতে যে সবচেয়ে বড়, ভয়-ডর নেই, স্বভাবে ভদ্র ও বুদ্ধিমান, অথচ আমাদের মত জঙ্গলে একসঙ্গেই একভাবে থাকবে এমন একজনকেই আমরা রাজা করব। আমি সব দিক থেকে ভেবে সিংহকে আমাদের রাজা করতে চাই। বলেই ভাল্লুক বসে পড়ল।

এবার টাইটাং নেকড়ে উঠে দাঁড়াল,—এ পৃথিবীতে মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান। কিন্তু মানুষ আমাদের দেখলেই মেরে ফেলে, নয়ত ধরে নিয়ে খাঁচায় পুরে রাখে। কখনও কখনও আবার আমাদের কাউকে দিয়ে চাকরের মত কাজ করায়, তাই মানুষকে রাজা করা চলবে না।

সব পশুপাখি চিৎকার করে ওঠে,—ঠিক, ঠিক। কোনমতেই মানুষকে রাজা করা চলবে না।

নেকড়ে আবার বললে,— আমিও সিংহকে আমাদের রাজা করতে চাই। সিংহকে মানুষও ভয় পায়। সবদিক থেকেই ভেবেই বলছি সিংহকে আমাদের রাজা করলেই ভাল হয়।

এমন সময় বুড়ো সুবুদ্ধি বাঁদর উঠে বলল,—বন্ধু পাখিরা, মাছেরা ও পশুরা, সবাইকে কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হচ্ছে, সবাই ভেবেচিন্তে উত্তর

দেবে, সিংহ রাজা হলে তোমাদের আপত্তি আছে কিনা ? কুচকুচে কাক, তুমি সব পাখিদের মত জেনে নাও, আর ভাই উড়ুক্কু মাছ, তুমিও সব মাছেদের সঙ্গে কথা বলে নাও।

এদিকে হয়েছে কি, বোম্বেটে বাদুড়ের এসব ব্যাপার মোটেই ভাল লাগছিল না। মাথায় তার সারাক্ষণ দুষ্টুবুদ্ধি ঘুরপাক খায়। সে সোজা বাজপাখির কাছে চলে এসে বলল,—আপনারা ত আচ্ছা অদ্ভুত সবাই। আপনারা এই কতকগুলো অসভ্য জানোয়ারের অধীনতা স্বীকার করে নিচ্ছেন। আপনারা মাটিতে হাঁটতে পারেন, গাছের ডালে বসতে পারেন। সব চেয়ে বড় কথা, আপনারাই আকাশ জয় করেছেন, এ গুণ কারো আছে ? তবে কেন আপনারা ঐ জঙ্গলের পশুগুলোর অধীনে থাকবেন। আপনারা সবদিক থেকে বড়। আপনারা নিজেদের রাজা ঠিক করুন। তাছাড়া সবদিক থেকে বিবেচনা করলে ত আপনিই রাজা হবার যোগ্য।

বাজপাখি ও আশেপাশের পাখিরা বোম্বেটের কথা শুনে একটু চিন্তা করে বলল,—বাদুর কথাটা ঠিকই বলেছে। কুচকুচে, তুমি একটু দাঁড়াও, ভাল করে ভেবে দেখা যাক, কি করব আমরা।

এদিকে বোম্বেটে বাদুড় ততক্ষণে মাছেদের কাছে পৌঁছে গেছে। তিমিকে ঢেউয়ের মাথায় দেখে তার মাথার উপর চক্কর দিতে দিতে বলতে লাগল,—শুনুন, শুনুন, আপনার মত জলের বিশাল প্রাণী যে সমুদ্রের জাহাজও সহজে উল্টে দিতে পারে, সে কিনা স্থলের বুনো পশু সিংহের অধীনে থাকতে চায়। বলব কি, বলতে আমার লজ্জা করছে। সিংহ কি রাজা হবার যোগ্য, রাজা ত আপনারই হওয়া উচিত। দেখুন, পৃথিবীর একভাগ মাত্র স্থল, তিনভাগ জল। জলই যখন বেশী আর জলের শক্তিশালী প্রাণী আপনি, আপনিই বলুন, কার রাজা হওয়া উচিত। আপনারা আপত্তি করুন। মাছ বন্ধুরা, আপনারা নিজেদের আলাদা রাজা ঠিক করুন।

ছুটল উড়ক্কু মাছ পশুদের কাছে মাছেদের আপত্তি আর আলাদা রাজ্যের খবর নিয়ে।

ততক্ষণে কুচকুচে কাকও গাছ থেকে নেমে এসেছে। কুচকুচে একদম সিংহের সামনে এসে দাঁড়াল, ভয়-ডর ওর চিরদিনই কম। বলল,—সিংহমশাই শুনুন, শুনুন অন্যসব পশুরা, আমরা, পাখিরা সিংহমশাইকে নিজেদের রাজা বলে মানি না। বলেই গান গেয়ে উঠল :

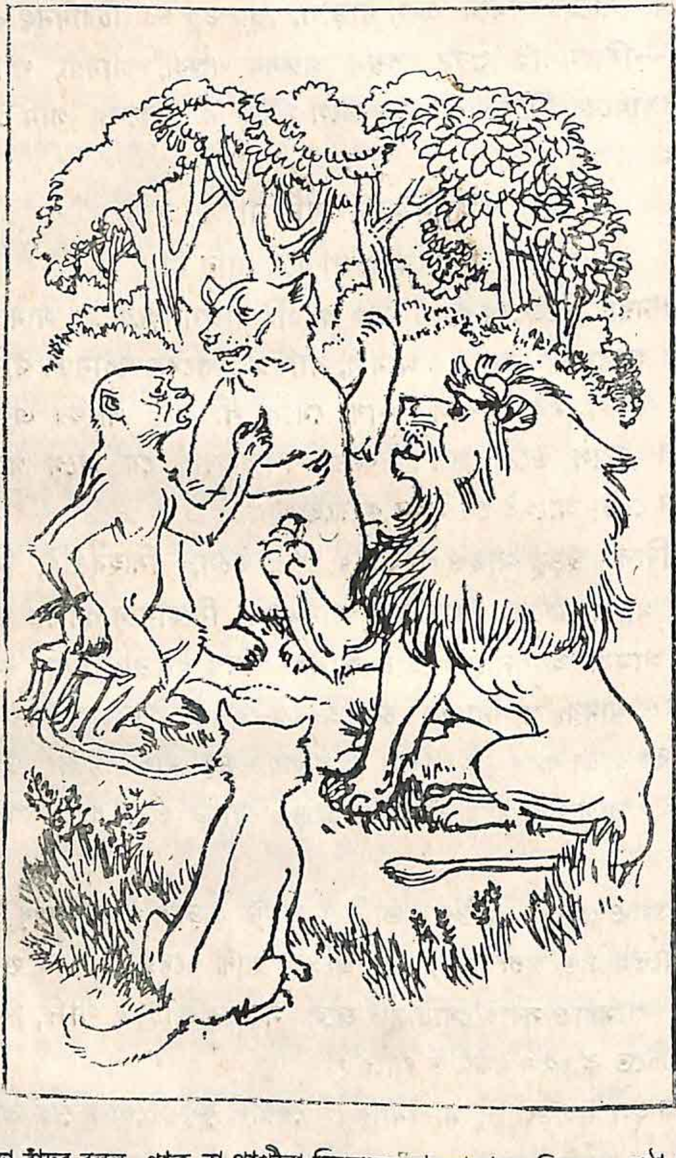
আনি-মানি জানি না,
সিংহকে রাজা বলে মানি না।

আমরা নিজেদের রাজা ঠিক করেছি বাজপাখিকে। আমাদের রাজ্যও আলাদা থাকবে। আমরা, পাখিরা পশুদের অধীনতা স্বীকার করতে রাজী নই। বলে, পাখা মেলে সাঁ করে গাছের একদম উপরের ডালে উঠে বসল। কারণ সিংহমশাই যে রাগে গর্‌গর্‌ করছেন সেটা আগেই সে লক্ষ্য করেছে।

এদিকে উড়ক্কু মাছও চিৎকার করে উঠল,—সিংহমশাই, সিংহ মশাই, আমরা জলের প্রাণীরাও আপনাকে সিংহাসনে বসাতে চাই না। আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক অনেক বড় রাজ্যে বাস করি, সংখ্যায়ও আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক বেশী। আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বলব না-আ-আ। বলেই উড়ক্কু মাছ সমুদ্রের উপর ঝপাং। রেগেমেগে বাঘ, সিংহ, নেকড়েও দৌড়ে ওকে ধরতে পারে না।

পশুরাও ক্ষেপে অস্থির। ভারি ত একটু উড়তে পারে—শুধু এই গুণ, তাতেই এত অহংকার! আর জলের প্রাণী ওদের ত কোন গুণই নেই। আমরাও সবাই মোটামুটি জলে সাঁতার কাটতে পারি, কিন্তু ওরা মাটিতে কতক্ষণ থাকতে পারে?

শুরু হল ঝগড়ঝাঁটি, মারামারি। শেয়াল কুকুর থেকে সুরু করে বাঘ সিংহ সবাই যখনই মাটিতে বা কাছাকাছি ডালে পাখি দেখে



বুড়ো বাঁদর বলল, থাক না পাখীরা নিজেদের রাজরাজাকে নিয়ে। পৃষ্ঠা ৬১

মেরে ফেলে তখনই। বিড়াল, ভামের জ্বালায় উঁচু গাছের ডালে পাখিরা নিজেদের ডিম ও ছোট ছোট ছানা রেখে শান্তি পায় না, দেখতে না দেখতে খেয়ে ফেলে।

এদিকে জন্তুদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে বাজ, চিল, শকুন পাখিদের হাত থেকে বাঁচানই মুস্কিল হয়ে উঠল। সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। শুধু কি বাচ্চা, দিনদুপুরে একটু আরাম করছে কোন জানোয়ার, ছোট ছোট পাখিগুলো তাদের ঠোক্কর মেরে পালিয়ে যায়।

আরও এক মুস্কিল হয়েছে, পশুরা জলের কাছাকাছি যেতেই পারছে না। নদীতে জল খেতে গেলেই পা কামড়ে ধরছে। কই, শিঙ্গি, মাগুর ত জলের ধারে ধারে পাহারায় বসে আছে। কোন জন্তু জলে নামলেই ভীষণ জোরে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে, আর সমুদ্রের জলে কেউ স্নান করতে গেলে তাকে হাঙ্গর খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে।

মাছদের অবস্থাও খারাপ। নদীর ধারে সামুক, গুগলি বা কোন পোকামাকর খেতে মাছেরা আসতেই পারছে না ডাঙার কাছে। জলের মধ্যে একটু লাফালাফি করবে তারও কোন উপায় আছে? দেখলে বাঘ সিংহ পর্যন্ত এক লাফে তাদের ধরে খেয়ে ফেলছে।

সারাক্ষণ আতঙ্ক, কে কাকে কখন মেরে ফেলে, খেয়ে ফেলে।

শেষে বুড়ো সুবুদ্ধি বাঁদর সবাইকে বোঝাল, এভাবে কিছুতেই আমরা বাঁচব না। এই কামড়াল, এই মারল করে কি বাঁচা যায়? ওরাও বাঁচবে না, আমরাও থাকব না।

ঝামুরঝুমুর ভাল্লুক রাগ-রাগ মুখে বলল,—তবে কি করতে বল?

বুড়ো বাঁদর বলল,—থাক না পাখিরা নিজেদের বাজ রাজাকে নিয়ে, আর মাছেরা তিমি রাজা নিয়ে আলাদা আলাদা রাজ্যে।

সিংহ রেগে বিচ্ছিরি চিৎকার করে ওঠে,—তবে কি আমাদের আমসিমুখো পাখি বাজ কিংবা জলের হোৎকা তিমির কথা শুনে চলতে হবে?

—আরে না-না, আমাদের রাজা আপনিই থাকবেন। কিন্তু তিনটে আলাদা দেশের মধ্যে ত বন্ধুত্ব হতে পারে।

টাইবাং নেকড়ে বলল,—সেটা কি রকম ?

—আমরা কেউ কাউকে শত্রু বলে মনে না করলেই হল। দেখলেই মেরে ফেলতে হবে, নয় খেয়ে ফেলতে হবে, এ সবের কি খুব দরকার আছে ? আমরা জঙ্গলে ত মোটামুটি মিলেমিশে থাকি, তেমন কি হয় না ?

সব পশুদের চুপ করে থাকতে দেখে সুবুদ্ধি বাঁদর আবার বলল,—এটা করা কি খুবই কঠিন ? দেখ, আমার ত মনে হয় এভাবে থাকলে আমরা আমাদের রাজ্যে, পাখি আর মাছেরা তাদের নিজের নিজের রাজ্যে ভালই থাকবে।

—কিন্তু পাখিদের আর মাছেদের এসব কথা বোঝাবে কে ? যে যাবে তাকে ওরা নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।

—সে ভার আমার। বুড়ো বাঁদর উত্তর দিল।

—বেশ, এভাবে ঝগড়া আর মারামারি করে কোন লাভই ত হচ্ছে না। মাঝ থেকে কিছু জন্তু মরছে, নয় কিছু মাছ, কিংবা কিছু পাখি মারা যাচ্ছে। এবার বন্ধুত্ব করেই দেখা যাক। তুমি রওনা হয়ে যাও বুড়ো দাদু, চিতা বলল।

সুবুদ্ধি বুড়ো হলে কি হবে, তার গায়ে খুব জোর। সে করল কি, অনেক দেখে দেখে যে প্রকাণ্ড গাছের মাথায় বাজপাখির বাসা সেই গাছে উঠতে লাগল। বুড়োকে বাসার কাছাকাছি দেখে বাজ আর তার গিন্নী ত তেড়ে এলই, সঙ্গে চিল শকুন বড় বড় পাখিরা, আর শালিক, টিয়া, ঘুঘু ছোট ছোট পাখিরাও ছুটে এল।

সুবুদ্ধি হাত জোড় করে খুব নরম গলায় বলল,—আমার একটা কথা সবাই শুনুন। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আমি শুধু বলতে এসেছি, আমরা—পশুরা আর মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করতে চাই না। আমরা বুঝেছি এভাবে ঝগড়া করা ভাল নয়। তাই

আমি বলতে এসেছি তোমাদের যিনি রাজা তিনিই তোমাদের রাজা থাকুন। তিনিই তোমাদের সব সুখ-দুঃখ দেখুন। আমাদের রাজ্যে আমাদের রাজা সিংহমশাই আমাদেরটা দেখবেন। এর জন্য এত ঝগড়াঝাঁটির কোন দরকার আছে নেই।

পাখিরা বলল,—সে ত ঠিকই। আমরা যদি আমাদের আলাদা রাজ্যে সুখে থাকি তবে শুধুশুধু পশুরাজ্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাব কেন? পশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমরা রাজী।

—তাহলে আসছে কাল নিজেদের রাজা বাজরাজাকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে জঙ্গলে সবাই আসবে। আমাদের বন্ধুত্ব নিশ্চয়ই সুন্দর হবে। জয়, পাখি রাজ্যের জয়, বাজরাজার জয়।

বুড়ো বাঁদর সুবুদ্ধি তখন সমুদ্রের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে তিমি মাছকে ডাক দিল। ছুটে এল সব মাছেরা। বুড়ো সুবুদ্ধি হাত জোড় করে মিষ্টি কথায় তাদেরও বোঝাল যে, পশুরা আর মাছদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। এখন তারা মাছদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই চায়।

সুবুদ্ধি মাছদের বলল,—এভাবে ঝগড়া আর মারামারি করলে সবারই ক্ষতি, লাভ কিছু নেই। তার চেয়ে এসো না, আমরা ভাব করে নি। মাছেরা ত বুড়ো সুবুদ্ধির কথা শুনে খুব খুশী। তাদেরও আর ঝগড়া করতে ভাল লাগছিল না।

বুড়ো বাঁদরের কথায় তারা বলল,—কাল আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে গিয়ে জঙ্গলের পশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেব।

হলও তাই। পরদিন দুপুরবেলা সবাই এল। মাছেরা সমুদ্রের ধারে, পাখিরা গাছে-গাছে, আর গাছের তলায় পশুরা। সবার সঙ্গে সবার খুব ভাব হয়ে গেল।

বুড়ো সুবুদ্ধি বাঁদর বলল,—পাখিদের রাজা বাজ, মাছেদের রাজা তিমি, আর পশুদের সিংহ—তিন রাজারই জয় হোক। প্রত্যেক রাজা নিজের নিজের রাজ্যে প্রজাদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে থাকুন। আমাদের তিন দেশের মধ্যে আজ থেকে বন্ধুত্ব হল।

পশুরা, পাখিরা, আর মাছেরা তিন রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

এরপর সবাই কিন্তু ভীষণ রেগে গেল বোম্বেটে বাদুড়ের উপর। পাখিরা বোম্বেটেকে দেখলেই ছুটে ঠোকরাতে যায়। বলে, ওটা পাখিই নয়। ঐ শয়তানটাকে আমাদের রাজ্যে থাকতে দেব না। তাড়া, তাড়া ওটাকে।

পশুরা ত ওকে দেখলেই ছিঁড়ে খায় আর কি!

জলের প্রাণীরা ওকে জলের ধারে কাছে আসতেই দিল না।

কি আর করে! বোম্বেটে দিনের বেলা বড় বড় গাছের অন্ধকারে পাতার আড়ালে মাথা নীচু করে পা দিয়ে শক্ত করে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকে, যাতে ওকে দেখে কেউ চিনতে না পারে। অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি ঘুরে বেড়ায়। তবে, স্বভাব যায় না ম'লে। কোন্ কোন্ গাছে কি কি ফল-পাকুড় আছে দেখে এদিক ওদিক ছুটে ছুটে উড়ে উড়ে খবর দিতে চেষ্টা করে—কিচ্-কিচ্-কিচ্।

যদি পাখিরা তার কথা ঘুমের মধ্যে শুনতে পেয়ে পরদিন নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে। কুচুটে স্বভাব যাবে কোথায়।



শ্রেষ্ঠ উপহার

অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। পৃথিবীতে ছিলেন এক মস্ত রাজা। রাজার হাতিশালে অনেক হাতি, ঘোড়াশালে অনেক ঘোড়া। রাজভাণ্ডার ধনরত্ন মণিমাণিক্যে ভর্তি।

রাজার শ্বেতপাথরের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে থাকেন রাজা ত্রিভুবনপতি, তাঁর সুন্দরী রানী বিভাবতী, আর তিন রাজপুত্র—সুকণ্ঠ, সুগত ও সুধর্ম।

তিন রাজপুত্র দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি গুণবান। সব শাস্ত্র পড়া হয়ে গেছে, সব বিদ্যা শেখা হয়ে গেছে। কিন্তু এই তিন রাজপুত্রকে নিয়ে রাজার শান্তি নেই। বড় ঝগড়া করেন তাঁরা। সব সময় ঝগড়া, বিবাদ আর মারামারি। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সুকণ্ঠের নামে নালিশ করে সুগত, সুগতের নামে সুধর্মা।

রানী রাজপুত্রদের ঝগড়া থামাতে থামাতেই অস্থির। শেষে রাজপুত্রদের ঝগড়া রানীও থামাতে পারেন না। তাদের ঝগড়ায় প্রজারা অতিষ্ঠ, রাজপ্রাসাদের ধারে কাছে কেউ আসে না।

শেষ পর্যন্ত রানী একদিন আর থাকতে না পেরে রাজাকে বললেন,—মহারাজ, তোমার তিন ছেলের কিছু একটা ব্যবস্থা কর।

রাজা বললেন,—আমিও এদের ঝগড়া দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠছি। কি করা যায় তাই ভাবছি!

—যা হোক, তাড়াতাড়ি কিছু একটা ব্যবস্থা কর, আর ত থাকা যায় না।

রাজা মন্ত্রিকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রি এলেন, বললেন,—কি মহারাজ?

রাজা বললেন,—মন্ত্রি, বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আমার তিন ছেলের কথা ত তুমি জানো।

—হ্যাঁ মহারাজ। রাজপুত্র সুকণ্ঠ, সুগত ও সুধর্ম—তিনজনেই সমান গুণী এবং রূপবান।

—কিন্তু তুমি ত এ-ও জানো যে তিনজনের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। সামান্য কারণ নিয়ে ওরা সারাক্ষণ ঝগড়া করে।

মন্ত্রি বললেন,—এক কাজ করুন মহারাজ, তিনজনকে রাজ্যের তিনদিকের আলাদা আলাদা দেশের রাজা করে পাঠিয়ে দিন। তাহলে গুণী রাজার কাছে প্রজারা ভাল থাকবে, আর আলাদা-আলাদা থাকায় রাজপুত্রদের মধ্যে ঝগড়াও হবে না।

—কিন্তু মন্ত্রি, এই তিনজনের মধ্যে যোগ্য কে, তাকেও আমায় বাছতে হবে। কারণ সেই হবে আমার পর এই রাজ্যের রাজা।

মন্ত্রি রাজার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন,—মহারাজ, আপনি তিন রাজপুত্রকে পাঠাবার আগে বলবেন, তোমাদের তিন বছর সময় দিলাম, তিন বছর পর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দরকারী ও দামী জিনিস আমার জন্য নিয়ে আসবে সেই হবে আমার পর দেশের রাজা। সমস্ত রাজত্ব তারই হবে।

পরদিন সকালে মহারাজ ত্রিভুবনপতি রাজপুত্রদের রাজসভায় ডেকে পাঠালেন। সুকণ্ঠ, সুগত ও সুধর্ম তিনজনেই রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন,—তোমরা তিনজনেই এখন যথেষ্ট উপযুক্ত হয়েছ। আমি এখন রাজ্যের কিছু কিছু ভার তোমাদের দিতে চাই। আশা করব তোমরা তিনজনেই খুব সুন্দর ভাবে রাজ্য চালাবে।

তিন রাজপুত্রই এক সঙ্গে বললেন,—নিশ্চয়ই।

রাজা বললেন,—তোমরা শুধু রাজ্যই চালাবে না, প্রজাদের দুঃখ, কষ্ট দেখবে। তারা যাতে সুখে শান্তিতে থাকে তার ব্যবস্থা করবে, সেই সঙ্গে আরও একটা কাজ করতে হবে।

তিন রাজপুত্রই বলে উঠলেন,—কি কাজ মহারাজ ?

—কাজটা হল, তোমরা তিনজনেই আমার জন্য এমন কিছু জোগাড় করবে, যা হবে পৃথিবীর সব চেয়ে দরকারী এবং দামী। আমি তোমাদের তিন বছর সময় দিলাম। ঠিক তিন বছর পর এই দিনে তোমাদের মধ্যে যে আমাকে সব চেয়ে দরকারী ও দামী উপহার দেবে সেই হবে আমার পর এই রাজ্যের রাজা।

তিন ভাই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিন দিকে। সুকণ্ঠ গেলেন পূর্ব দিকে, সুধর্ম গেলেন পশ্চিম দিকে, আর সুগত উত্তর দিকে।

সুকণ্ঠ পূর্বদেশে এসে প্রথম দিনই রাজসভাতে সবাইকে জানিয়ে দিলেন,—প্রজারা, সবাই শোন, এত অল্প টাকা কর দিলে চলবে না। তোমরা প্রত্যেকে যত টাকা আগে রাজাকে দিতে, তার দ্বিগুণ টাকা আমাকে দিতে হবে।

তিনি ভাবলেন, পৃথিবীতে সব চেয়ে দামী জিনিস টাকা। আমি তিন বৎসরে এত টাকা জোগাড় করব যা অন্য ভাইরা, বা রাজাও ভাবতে পারবেন না।

এদিকে প্রজারা হায়-হায় করতে লাগল। তারা দল বেঁধে এল। বিশেষ করে গরীব প্রজারা সুকণ্ঠের কাছে এসে হাত জোড় করে বলল,—প্রভু, আমরা বড় গরীব, এত টাকা কোথায় পাব, আমাদের দয়া করুন।

একথা শুনে সুকণ্ঠ ত রেগে আগুন।

—আমি কিছু শুনতে চাই না। টাকা আমার চাই-ই। তোরা টাকা না দিয়ে কোথায় যাস্ দেখছি।

সুকণ্ঠ হাঁক দিলেন,—প্রহরী, এদের সকলকে ভাল করে বেঁধে চাবুক লাগাও।

চাবুক পড়তে লাগল সপাসপ্। মানুষগুলো ভীষণ কাঁদতে লাগল। সুকণ্ঠের কিন্তু এতটুকুও দয়া হল না। তাকে যে রাজা হতেই হবে। টাকা চাই, অনেক টাকা।

সুকণ্ঠের এ অত্যাচার প্রজারা সহ্য করল দু'বছর। সুকণ্ঠকে টাকা দিতে দিতে নিজেরা না খেয়ে মরতে লাগল। শেষে আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা রাজা ত্রিভুবনপতির দরবারে এসে রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

রাজা প্রজাদের কাছে সুকণ্ঠের অত্যাচারের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

প্রজাদের শান্ত করে রাজা বললেন,—তোমাদের সবাইকে কিছু-কিছু টাকা দিচ্ছি, তোমরা সবাই দেশে ফিরে যাও। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর ব্যবস্থা করছি।

পশ্চিম দেশ শাসন করতে এসে সুধর্ম ভাবলেন,—আমি তিন ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট। আমাকে বাবা এমনিতে কোনদিনই রাজা করবেন না। যদি আমি সবচেয়ে দামী জিনিস নিয়ে গিয়ে বাবাকে খুশী করতে পারি তবেই বাবা আমাকে রাজা করতে বাধ্য হবেন।

পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী জিনিস কি? সোনা! সুধর্ম ঠিক করল, সে এত সোনা জোগাড় করবে যে, আর কেউ তা চিন্তাই করতে পারবে না। এ সোনা প্রজাদের কাছ থেকেই জোগাড় করতে হবে। প্রজাদের ঘরের সব সোনা, ছলে হোক, বলে হোক কেড়ে নিতে হবে। আমার অনেক, অনেক সোনা হবে। এখন কি করে নেওয়া যায়? সুধর্ম চিন্তা করে।

কিন্তু জোর করে কেড়ে নিলে প্রজারা মহারাজের কাছে নালিশ করবে। বাবা ভীষণ রেগে যাবেন, আমার রাজা হওয়াও হবে না। অন্য কিছু উপায় ঠিক করতে হবে।

সুধর্ম গরীব, বড়লোক—সব প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যার বাড়ীতে যান তাকেই বলেন,—রাজা শীগগির একটা স্বর্ণযজ্ঞ করবেন। তোমাদের সকলের কাছে যার যত সোনা আছে

রাজা তা চেয়েছেন। এ যজ্ঞে অনেক, অনেক সোনা দরকার। তবে যে যত সোনা দেবে, যজ্ঞের দিন ঠিক দ্বিগুণ সোনা ফেরত পাবে। তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন থাকবে সেদিন রাজবাড়ীতে।

—তাই নাকি! দ্বিগুণ সোনা ফেরত পাওয়া যাবে? শুনে সবাই যার যত সোনা ঘরে ছিল এনে দিল সুধর্মকে।

সুধর্ম বললেন,—দেখছ না, আমি রাজার হয়ে সোনা জোগাড় করছি, আর কে কতটা সোনা দিচ্ছে সব লিখে রাখছি। যজ্ঞের দিন সবাইকে দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে ত।

প্রজারা ঘরে যার যা সোনা ছিল সব এনে রাজপুত্র সুধর্মকে দিল।

সোনার পাহাড় তৈরী হল।

এদিকে তিন বছর প্রায় হয়ে আসছে। পশ্চিম দিকের প্রজারা রাজবাড়ী থেকে স্বর্ণযজ্ঞের কোন খবর পায় না। নেমন্তন্নও পায় না। তাদের মনে সন্দেহ হয়। তারা দল বেঁধে রাজবাড়ীতে আসে। কোথায় স্বর্ণযজ্ঞ? কোথাও কিছু নেই। তাদের সন্দেহ বাড়ে। তারা রাজাকেই প্রশ্ন করে,—মহারাজ, আপনার এখানে স্বর্ণযজ্ঞ কবে হবে?

মহারাজ অবাক হয়ে যান,—স্বর্ণযজ্ঞ! এ ধরনের কোন যজ্ঞ হবার ত কথা নেই। তোমরা আমার স্বর্ণযজ্ঞের কথা কোথা থেকে শুনলে?

—মহারাজ, আপনার ছোট ছেলে রাজপুত্র সুধর্ম আমাদের বলেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই আপনি স্বর্ণযজ্ঞ করবেন এবং এই যজ্ঞে আপনার অনেক সোনার দরকার। তাই তিনি আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ঘরের যত সোনা ছিল সব চেয়ে নিয়েছেন। অবশ্য এও বলেছেন, যে যত সোনা দেবে যজ্ঞের দিন সে তার দ্বিগুণ সোনা ফেরত পাবে। কবে যজ্ঞ হবে মহারাজ?

রাজা প্রজাদের মুখে সুধর্মের কথা শুনে এত অবাক হয়ে যান যে কোন কথাই বলতে পারেন না।

মন্ত্রি মহারাজের অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি বললেন,—তোমরা আরও কিছুদিন পর আগামী বসন্তোৎসবে আসবে, সেদিন মহারাজ স্বর্ণযজ্ঞ করবেন।

প্রজার দল ফিরে যায়।

রাজা ত্রিভুবনপতি বললেন,—আগামী বসন্তোৎসবে স্বর্ণযজ্ঞ করব, সে কি মন্ত্রি ?

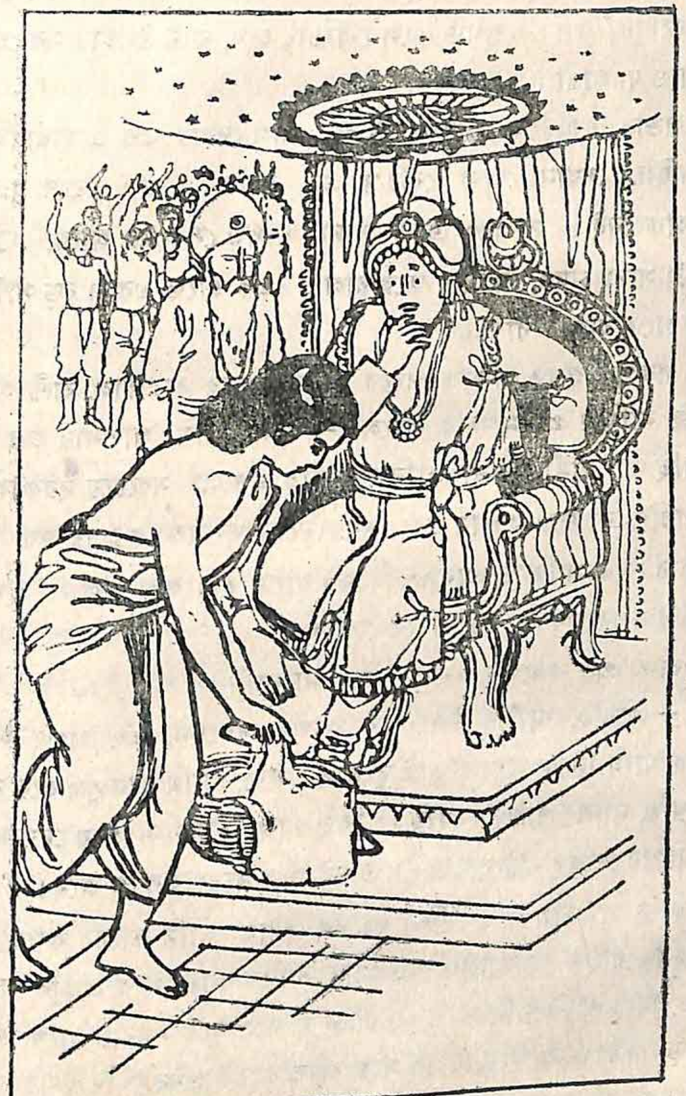
—মহারাজ, তিন বছর আগে এই দিনে তিন রাজপুত্র রাজ্যের তিনদিকে যান দেশ শাসনের ভার নিয়ে। শর্ত ছিল, তিন বছর পর ঠিক এই দিনটিতে যে সবচেয়ে দরকারী ও দামী জিনিস এনে আপনাকে উপহার দেবে সেই হবে আপনার পর এই রাজ্যের রাজা। যুবরাজের অভিষেকের জন্য যজ্ঞের আয়োজন ত করতেই হবে।

আজ বসন্তোৎসব। সমস্ত রাজবাড়ী নানা রঙের ফুল আর পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রাজসভার মাঝখানে একটি যজ্ঞের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রায় একই সঙ্গে এসে পৌঁছলেন রাজপুত্র সুকণ্ঠ ও সুধর্ম। দুজনের পিছনে প্রায় একশ' উট, হাতী আর ঘোড়া এসেছে। এদের পিঠে হাজার-হাজার ঘড়া টাকা এনেছেন সুকণ্ঠ। ঠিক ততোখানি সোনা এনেছেন সুধর্মও।

সুকণ্ঠ বললেন,—বাবা, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস আপনার জন্য এনেছি—টাকা। এর চেয়ে দামী আর কিছুই হতে পারে না। আমার কাছে এত টাকা আছে যা দিয়ে আমি সুগত ও সুধর্মের রাজ্য কিনে নিতে পারি। ঐযে দেখছেন হাতী, ঘোড়া, উট—সবার পিঠের ঘড়াগুলিতে ভর্তি রয়েছে টাকা, এ সবই এখন আপনার।

হাঃ, হাঃ, হাঃ! সুধর্ম হাসতে হাসতে থামিয়ে দেয় সুকণ্ঠকে, —দাদা, টাকার চেয়েও দামী সোনা। সোনা দিয়ে সবই করা যায়। আমার এত সোনা আছে যে আমিও তোমার ও সুগতের রাজ্য



সাজির ওপর যে কাপড় দেখছেন আমি নিজে অনেক কষ্টে বুনেছি। পৃষ্ঠা ৭২

এখনই কিনে নিতে পারি। বাবা, ঐ পশুগুলোর পিঠে যে বস্তাগুলো দেখছেন, ওর সবগুলোতেই সোনা ভর্তি। এসবই এখন আপনার।

মহারাজ ত্রিভুবনপতি দুজনকেই থামিয়ে দিলেন, বললেন,—তোমরা চুপ কর। সুগত এলেই বিচার হবে, কার উপহার সব চেয়ে দামী ও দরকারী।

সভার একদিকে যেখানে উৎসবে যোগ দেবার জন্য প্রজারা ভিড় করেছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল সুগত। তার পরণে রাজ-পোষাক নেই। সাধারণ একটা সাদা কাপড় সে পরে আছে, গায়ে একটা সাদা চাদর, কোমরে তরোয়াল। এক হাতে একটা বড় সাজি, অন্য হাতে বাঁশের বাঁশী।

রাজপুত্র সুগত রাজার পায়ের কাছে নিজের তরোয়াল, বাঁশী আর সাজি নামিয়ে প্রণাম করে বললেন,—বাবা, আমি আপনার জন্য যা এনেছি তা দামী কিনা জানি না, তবে এগুলো সবচেয়ে দরকারী। তরোয়াল রাজ্যের অন্যায় এবং শয়তানদের শায়েস্তা করবার জন্য খুব দরকার। এ সাজিতে এনেছি নিজের হাতে চাষ করা চাল। সুগত সাজির উপরকার কাপড় সরিয়ে দেখাল।

রাজা প্রশ্ন করলেন,—আর কিছু আনোনি ?

—এনেছি, সাজির উপরে যে কাপড় দেখছেন, এই কাপড় আর চাদর আমি নিজে অনেক কষ্টে বুনেছি। বাবা, আমি রাজপুত্র হয়ে যুদ্ধ শিখেছি, নানা শাস্ত্র শিখেছি। কিন্তু রাজ্য চালাতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের দেশের মানুষেরা বেশীর ভাগই খেত-খামারে কাজ করে। আমি সে কাজ জানতাম না। তিন বছরের চেষ্টায় আমি তাদের কাছে সে কাজ শিখেছি। তাছাড়া বাবা, আমি তাঁতির কাছ থেকে একটু-আধটু তাঁত বুনতেও শিখেছি। পাছে রাজপুত্র বলে দূরে সরিয়ে রাখে তাই ঝগড়া বা রাগ না করে, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই এসব শিখেছি।

মহারাজ বললেন,—আর এই বাঁশী !

সুগত বললেন,—বাবা, বাঁশী বাজাতে আমাকে শিখিয়েছে এক

রাখাল ছেলে। যখন আমার রাজ্য চালানোর কাজ থাকত না, ক্ষেতের কাজ থাকত না, তখন বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ পেতাম। সেই আনন্দও আমি আপনার জন্য এনেছি। বাবা, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টা করেও আমি আপনার জন্য এর চেয়ে দরকারী আর দামী জিনিস আনতে পারিনি।

সুকণ্ঠ ও সুধর্ম ত হেসেই কুটিপাটি, সুগতের উপহার দেখে আর কথা শুনে।

হঠাৎ রাজসভার একদিক থেকে গোলমাল শোনা যায়,—মহারাজ, আমাদের রাজপুত্র সুগতকে আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমরা তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি। আমরা একদিনও তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

রাজা ত্রিভুবনপতি এবার উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—উত্তর দেশের প্রজারা, তোমরা শান্ত হও, তোমাদের রাজপুত্রকে নিশ্চয়ই তোমরা ফিরে পাবে।

সভার সবাই শান্ত হল।

মহারাজ বললেন,—সুকণ্ঠ, সুধর্ম, তোমরা আজ থেকে রাজপ্রাসাদ আর এ রাজ্য থেকে নির্বাসিত হলে। কোন রাজ্য চালাবার ভারও তোমাদের হাতে আর থাকবে না।

সুকণ্ঠ ও সুধর্ম বললেন,—কেন মহারাজ, আপনার কথামত দামী জিনিস আনি নি?

রাজা ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন,—সুকণ্ঠ, তুমি প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে এ টাকা জোগাড় করেছ। একে তুমি বলছ দামী! তোমাকে নির্বাসন দণ্ড পেতেই হবে। তার আগে যাও, যার কাছ থেকে যে টাকা অন্যায় ভাবে কেড়ে এনেছ তাদের সব ফিরিয়ে দিয়ে এসো। সেনাপতি তুমি সুকণ্ঠের সঙ্গে যাও, দেখ, সে আমার কথামত কাজ করছে কিনা। আর সুধর্ম, তুমি মিথ্যা কথা বলে প্রজাদের ঠকিয়েছ। ছিঃ! তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে। রাজ্য আর

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার আগে তুমি যার কাছ থেকে যত সোনা নিয়েছ সব হিসেব করে ফিরিয়ে দাও। মন্ত্রিমশাই তোমার সঙ্গে থাকবেন।

এবার রাজা রাজপুরোহিতের দিকে ফিরে বললেন,—ঠাকুর, যজ্ঞের আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। তারপর সভার সকলের দিকে চেয়ে বললেন,—রাজপুত্র সুগতের অভিষেক হবে। সুগতই হবে আমার পর এ রাজ্যের রাজা। সুগত, তুমি যজ্ঞের আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

মহারাজের কথা শেষ না হতেই পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চার দেশের প্রজারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল,—জয়, মহারাজ ত্রিভুবনপতির জয়, যুবরাজ সুগতের জয়।



তিন কুকুরের কাণ্ড

বেশ বড়সড় চেহারা। ছোট ছোট চক্‌চকে কালো লোমে ঢাকা সারা গা। অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ভৌ—ঔ—ঔ করে সামনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড হাঁ-টা মেলে ধরে, ওর বড় বড় সাদা দাঁতগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করে, তখন কিন্তু সত্যি ভয়ঙ্কর দেখায় ওকে। এমনিতে বেশ শান্ত কালোসোনা। সারাদিন গুটিসুটি মেরে ভোলানাথবাবুর দোরের সামনে বসে থাকে। বাড়ীতে কেউ ঢুকলে কিচ্ছুটি বলবে না, পিছু পিছু ঘুরঘুর করবে। কিন্তু যেই চলে যাবার সময় হল, অমনি সামনে এসে সোজা দুপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এবং তখন কি রাগ, এই বুঝি খেয়ে ফেলল।

যেই ভোলানাথবাবু বললেন,—ও মেয়ে, ওকে ছেড়ে দে, ও বাড়ী যাক। ব্যস্, কালোসোনা চুপটি করে বসে পড়ল ভোলানাথবাবুর পায়ের কাছে। কালোসোনা ভোলানাথবাবুর খুব বাধ্য।

ভোলানাথবাবু বিকেলে কাজ থেকে বাড়ী ফিরেই ডাক দেন,—আমার লক্ষ্মী মেয়ে কোথায়?

বাড়ীর সবার আগে ছুটে আসে কালোসোনা। ভোলানাথবাবু ঘরে ঢুকে জুতো খুলতেই ও জুতো জোড়া দাঁতে ধরে নিয়ে যায় এবং পরমুহূর্তে নিয়ে আসে ভোলানাথবাবুর ঘরে পরার চটি। ডাকে,—"ভৌ" অর্থাৎ পর।

সন্ধ্যার সময় কোনদিন যদি ভোলানাথবাবুর কোথাও যাবার দরকার হয়, হাঁক দেন,—ও কালোসোনা, আমি যে বিজয়দের বাড়ী যাব। আর সঙ্গে সঙ্গে কালোসোনা একটা হারিকেন নিয়ে এসে ঠক করে রেখে দিল ভোলানাথবাবুর পায়ের কাছে। তারপর দু'বার ডনবৈঠক সেরে সঙ্গে সঙ্গে চলল ভোলানাথবাবুর লণ্ঠনটা মুখে করে।

সারারাত কালোসোনার চোখে ঘুম নেই একটুকুও। কখনও পায়-চারি করে ভোলানাথবাবুর ঘরের সামনে, কখনও বাগানে, নয়ত বাড়ীর পিছনের জঙ্গলটা আড়াল করে আছে যে প্রাচীরটা, তার ধারে ধারে।

কালোসোনার সঙ্গে থাকে ও-বাড়ীতে আরো দুটো কুকুর, ভুতো—কালো আর ইট-ইট রঙে ভর্তি গায়ের লোম, আর আছে সাদা-কালো বড় বড় লোমে ভর্তি বিল্টু। দুজনেরই কিন্তু ছোট খাটো চেহারা।

ভুতো আর বিল্টু কিন্তু ভারি দুষ্টু। কারু কথা শোনে না, কোন কাজই করে না। খায়-দায় আর ঘুমায়। প্রায়ই মারধোর খায়। বাড়ীর সবাই রাগ করে বলে, দাও তাড়িয়ে ও দুটোকে।

ওদের তাই ভারি হিংসে কালোসোনাকে। কথায় কথায় ওরা ঝগড়া করে কালোসোনার সঙ্গে।

কালোসোনা যতই বোঝায়, আরে কেন এত রাগ করছিস? তোরা যদি ঠিকমত কাজ করিস তোদেরও সব্বাই ভালবাসবে। ভুতো রাগ-রাগ মুখ করে বলে, কি কাজ করব শুনি, তোর মত লণ্ঠন বইতে পারি না আমরা। আমাদের দুজনেরই যা ছোটখাট চেহারা।

বিল্টু বলল, আরে আমরা খোশামোদ করতে পারি না, তাই সব্বাই আমাদের দূর-দূর করে।

কালোসোনা বলে, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের কাজ যদি আমরা খুব ভাল করে করি, তাহলে কেউ আমাদের উপর রাগ করতেই পারে না। যার যা কাজ তা করি না বলেই ত যতসব গণ্ডগোল।

—কি আমাদের কাজ শুনি, খুব ত উপদেশ দিচ্ছিস। রাগে চিৎকার করে উঠল দুজনে একসঙ্গে।

কালোসোনা বলল, কেন, রাত্রিতে না ঘুমিয়ে বাড়ীটা পাহারা দেওয়া, ওটাই ত আমাদের কাজ।

ভুতো বলল, ওঃ, রাতে ঘুমোব না? সারারাত জেগে পাহারা দেব,

আহ্লাদ। তোর করতে হয় তুই কর, আমরা করব না। চল রে বিল্টু।

কালোসোনা বলল, তবে মারধোর খা।

বিল্টু কিন্তু ভুতোর মত রেগে গেল না। সামনের ডান পা-টা দিয়ে বা-কানটা চুলকে একটু ভেবেটেবে বলল, দেখ ভুতো, কালোসোনা কিন্তু ঠিক কথাই বলছে। আচ্ছা, একবার কালোসোনার কথা শুনে দেখাই যাক না।

ভুতোর কিন্তু তখনও রাগ যায়নি, খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে বলে ওঠে, বেশ ত কালোসোনাই বলুক না কি করব আমরা?

কালোসোনা বলল, আজ রাত্রি থেকেই তোরা দুজনেই আমার সঙ্গে বাড়ী পাহারার কাজে থাকবি। ক'দিন পর বাড়ীর সবাই যখন বুঝবে তোরাও সারারাত জেগে পাহারা দিস, দেখিস তোদের তখন সবাই কেমন আদর করে।

বিল্টু বলল, ঠিক আছে রে কালোসোনা, আমরা তোর কথা নিশ্চয়ই শুনব।

ভুতো বলল, দেখ বিল্টু, আমি কালোসোনার কথামত সারারাত জেগে বাড়ী পাহারা দেব গুণে গুণে সাতদিন। তারপরও যদি বাড়ীর মালিকরা আমায় দূরছাই করে ত কালোসোনার একদিন কি আমার একদিন।

দু'দিন পর সকালবেলা ভোলানাথবাবু চা খেতে খেতে বললেন, আরে, আমাদের ভুতো বিল্টু যে খুব ভাল হয়ে গেছে। কাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ফুটফুটে জোছনার আলো চারদিকে, জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি কি, আমাদের কালোসোনা বাড়ীর ওদিকে দৌড়ে যায় ত, ভুতো বিল্টু ছুটে যায় বাড়ীর পেছনে।

ভোলানাথবাবুর ছেলে বরুণ চোখ বড় বড় করে বলল, ভুতো বিল্টু না ঘুমিয়ে পাহারা দিচ্ছে, আশ্চর্য ব্যাপার!

ভোলানাথবাবুর মেয়ে ভূট্টাই ত হেসেই অস্থির, বলল, কালোসোনাকে দেখে ভুতো বিল্টুরও বোধহয় কাজ করার শখ হয়েছে, বাবা।

ভুতো বিল্টুকে চুপি চুপি কানে কানে বলল, শুনছিস তো বিল্টু, রাগ হয় কিনা বল ?

বিল্টু বলল, চুপ চুপ ভুতো, তবু ত ভোলানাথবাবু বলছেন আমরা কাজ করি। সময় মত আমরা বুঝিয়ে দেব আমরা সত্যি কাজ করি কিনা।

সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাত বাড়ছে, হঠাৎ সবার খেয়াল হল কালোসোনা কোথায় গেল ? ভুতো বিল্টুও নেই ত। খোঁজ, খোঁজ। বাগানে নেই, বারান্দায় নেই, ঘরে নেই ; সবাই ত অবাক, গেল কোথায় তিনটে।

এমন সময় ভোলানাথবাবুর মেয়ে ভূট্টাই এসে বলল, বাবা, দেখবে এস, কালোসোনা, ভুতো আর বিল্টু, বাগানের পেছনের উঁচু প্রাচীরটার কাছে বসে আছে। কত ডাকলাম কিছুতেই এল না।

—তাই নাকি, চল ত দেখি কি হল ওদের !

—আমি ত সারা বাগান খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখি ওরা তিন-জন ওখানে বসে আছে। কালোসোনা দেয়াল আঁচড়াচ্ছে আর রাগে গোঁ-গোঁ করছে। ভুতো বিল্টু কালোসোনার দুপাশে বসে আছে।

ভোলানাথবাবু ভূট্টাইয়ের কথা শুনে গিয়ে দেখেন সত্যিই তাই।

—কালোসোনা, ভুতো, বিল্টু, তোরা এখানে কি করছিস ? ও মেয়ে, খাবি চল, ওরে ভুতো বিল্টু তোরা আজ খাবি না ? বলে, ভোলানাথবাবু ওদের তিনজনের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। তিনজনেই লেজ নাড়ে কিন্তু জায়গা ছেড়ে ওঠে না।

শেষে ভোলানাথবাবু বলেন, থাক, ওরা যখন আসতে চাইছে না তখন থাক, তবে একটু খেয়াল রাখতে হবে ওরা আজ এমন করছে কেন।

ভোলানাথবাবু ভূট্টাই চলে যায়।

এদিকে হয়েছে কি, চারটে চোর অনেকদিন ধরে ঠিক করেছে

ভোলানাথবাবুর বাড়ী চুরি করবে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ওরা ভোলানাথবাবুর বাড়ীর পিছনের জঙ্গলে লুকিয়ে রইল।

—রাত একটু বেশী হতে দে, তারপর দেয়ালটা ভেঙ্গে বাগানে ঢুকতে পারলেই হল, একটা চোর বলল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাগানটা একটু ঘুরেই ভোলানাথবাবুর ঘর। আমি সকালবেলা বাড়ীর চারদিকটা ভাল করে দেখে এসেছি।

ওদের একজন বলল, শুনেছি বাড়ীতে কুকুর আছে।

—আমিও ত শুনেছি আছে, কিন্তু আমি যে সময় গিয়েছিলাম ঠিক সে সময় ভোলানাথবাবু কুকুরগুলোকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাই কুকুরগুলোকে দেখি নি আমি।

—আমার হাতে কি আছে দেখছিস ত। বলে, নিজের হাতের প্রকাণ্ড বড় ছোরাটা তুলে ধরে সবাইকে দেখাল চোরদের সর্দার। অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে ছোরাটা।

—আমাকে কামড়াতে এলেই দেব ঘ্যাচ করে পেটে বসিয়ে।

—দূর দূর, কুকুর আর কি করবে? দেখ সর্দার, তোমার মত অত বড় না হলেও আমাদের সকলের কাছেই ছোরা-ছুরি আছে।

—আজ ভোলানাথবাবুর ঘরে ঢুকতেই হবে আর ভাল রকম টাকাকড়ি সরাতে হবে, বলল চোরদের সর্দার।

চোরদের একজন বলল, এখন বেশ রাত হয়েছে, এবার দেয়ালটা ভাঙ্গা যাক।

—এই শুরু করছি, সর্দার বলল।

ওরা দেয়াল ভাঙ্গার কাজ আরম্ভ করল।

কালোসোনা, ভুতো আর বিল্টু তখনও কিন্তু ঐখানে বসে। ভুতোর ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। ও কালোসোনাকে বলল, দূর দূর, কেউ আসবে না, আজ শুধুশুধু ভয় পাচ্ছিস। চল বিল্টু, আমরা ঘুমোতে যাই। তোর কথা শুনতে গিয়ে মাঝ থেকে আজ খাওয়াও হল না।

কালোসোনা ওদের কানে কানে চুপি চুপি বলল, না, না, কখনও যাস না। কোন দুষ্টুলোক ভেতরে ঢুকবে বলে দেয়াল ভাঙ্গছে। আওয়াজ শুনছিস না?

ভুতো আর বিল্টু কান খাড়া করল, তাইত, এখন কি করা যায়? কালোসোনা বলল, তোরা দুপাশে থাক, আমি থাকি মাঝখানে, যেই লোকটা ঢুকবে একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ব তিনজনে।

হলও তাই, যেই না দেয়াল ভেঙ্গে চোরদের সর্দার ভেতরে ঢুকেছে, কালোসোনা, ভুতো আর বিল্টু একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে। সর্দার পড়ে গেল মাটিতে। হাতের ছোরাটা ছিট্‌কে পড়ল অনেক দূরে।

কালোসোনা চোর সর্দারের টুঁটি চেপে ধরেছে আর ভুতো কামড়ে ধরেছে একটা পা, আর বিল্টু একটা হাত। সর্দার যতই ধাক্কা দিয়ে কালোসোনাকে সরাতে চেষ্টা করে, কালোসোনা কিন্তু কিছুতেই ওকে ছাড়ে না। ভুতো আর বিল্টুও চোর-সর্দারের হাত, পা কামড়ে ধরে ত আছেই, আর সেই সঙ্গে সমানে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ—শিগগীর এস, শিগগীর এস।

তিনজনে মিলে চোর সর্দারকে কিছুতেই মাটি থেকে উঠতে দেয় না।

ওদের চিৎকারে বাড়ীর সবাই—ভোলানাথবাবু, তাঁর ছেলে, বাড়ীর চাকর-বাকর সবাই ছুটে এল, আর বাড়ীর সবার চিৎকারে ছুটে এল পাড়া-প্রতিবেশীরা।

এদিকে অন্য তিনটে চোর দেওয়ালের ভাঙ্গা ফুটো দিয়ে সর্দারের অবস্থা দেখে, সর্দারকে বাঁচাতে ভিতরে ঢুকবে ভাবছিল, এর মধ্যেই বাড়ীর সবাই লোকজন ছুটে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাল।

সবাই এসে সর্দার চোরকে ধরে ভাল করে বেঁধে ফেলল। কালো-সোনা, ভুতো আর বিল্টু তখন চোরকে ছেড়ে দিয়েছে। কি আনন্দ



কালোসোনা ভুতো আর বিল্টু একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে। পৃষ্ঠা ৮০

তখন ওদের। বিল্টু একবার ভোলানাথবাবুর পা চেটে দিচ্ছে, কখনও ভুতো বরুণের হাত চেটে দিচ্ছে আর কালোসোনা ত আনন্দে সবার মাঝখানে খানিকটা গড়াগড়িই খেয়ে নিল।

শেষ পর্যন্ত চোরটাকে বেঁধে বরুণ আর পাড়ার লোকেরা মিলে নিয়ে গেল থানায়।

এসব হাঙ্গামা মিটতে মিটতে সকাল হয়ে গেল। ভোলানাথবাবু মুখ-হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে বসেই সব্বাইকে বললেন, শোন, কালোসোনা ত আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমার ভুতো বিল্টুও কিন্তু সোনার ছেলে। এবার থেকে ওদের তিনজনকেই খুব যত্ন করবে সবাই। ওরা না থাকলে আমাদের আজ কি হ'ত!

বরুণ বলল, বাবা, লোকটার সঙ্গে মস্তবড় একটা ছোরা ছিল। চুরি ত হ'তই, আমাদেরও মেরে ফেলত হয়ত। তাছাড়া কতজন এসেছিল কে জানে?

বরুণের মা বললেন, মাগো, কি ভয়ানক! কালোসোনা, ভুতো, বিল্টুর জন্যেই আমরা সব্বাই কিন্তু প্রাণে বেঁচেছি আজ।

কালোসোনা এসব শুনে খুশিতে ভোলানাথবাবুর পায়ে মাথা ঘসছিল।

ভুট্টাই বিল্টু আর ভুতোকে একসঙ্গে টপ্ করে কোলে তুলে নিয়ে দুজনের মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ভুত-ভুতো, বিল্টুই-মিল্টাই তোরা কি কাজের ছেলে রে। আদর পেয়ে আনন্দে ভুতো আর বিল্টু তখন করছে কুঁই, কুঁই, কুঁই, আর তাদের লেজ নড়ছে টিক্-টিক্-টিক্।

চাঁদের আশীর্বাদ

যুবরাজ রণবীর উপযুক্ত হয়েছেন। রাজা বিশ্বেশ্বর কিছুদিনের জন্য তীর্থে যাবেন। আসলে রাজা ভাবলেন, এতদিন ত রাজত্ব করলাম, এবার ছদ্মবেশে আমার রাজ্যের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে হবে প্রজারা কে কেমন আছে ?

বুড়ো মন্ত্রি বললেন,—মহারাজ, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

রাজা বললেন,—আচ্ছা।

দিনক্ষণ দেখে রাজা ও মন্ত্রি দুজনে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে তীর্থযাত্রা করলেন।

যুবরাজ রণবীর রাজকার্য চালাচ্ছেন।

সারাদিন রাজ্যের নানা কাজ শেষ করে যুবরাজ ঘুমাতে এলেন। সারা ঘরে ধূপের সুবাস, রূপার খাটে নরম গদির বিছানা, দুধের মত সাদা চাদর, সোনালী ঝালর দেওয়া মশারী। যুবরাজ বিছানায় শুলেন।

—চাঁদটার কাণ্ড দেখ ? জানালার সামনে এসে এত হাসির কি আছে ? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি ?

যুবরাজ রানীকে ডাক দিলেন,—রানী, রানী।

রানী এলেন। ঘুমে তাঁরও চোখ জড়িয়ে আসছে। তবু এলেন, যুবরাজ ডাকছেন। কি যুবরাজ !

—রানী, সারাদিন খাটা-খাটুনি করে একটু আরাম করে শোব, চাঁদটা জানালার কাছে এসে বিরক্ত করছে।

রানী সখী বসন্তমঞ্জরীকে ডাক দেন,—ও বসন্তমঞ্জরী, বসন্তমঞ্জরী !

বসন্তমঞ্জরী বাইরে থেকে বলল,—যাই রানী।

সখী বসন্তমঞ্জরী এল।

রানী বললেন,—দেখ সখী, যুবরাজ সারাদিন খাটা-খাটুনি করে এসে কোথায় আরাম করে শোবেন, তা না, চাঁদটা জানালা দিয়ে এসে বিরক্ত করছে।

বসন্তমঞ্জরী ডাক দেয় দাসীকে, —ও খুতুর-মা।

—যাই মঞ্জরী দিদি।

দাসী এল।

—দেখত খুতুর-মা কি অন্যায়, যুবরাজ সারাদিন খাটা-খাটুনি করে এসে কোথায় আরাম করে শোবেন, তা না, চাঁদটা জানালা দিয়ে এসে বিরক্ত করছে।

খুতুর-মা ডাক দেয় খুতুর-বাপকে।

—ও খুতুর-বাপ, খুতুর-বাপ।

খুতুর-বাপ আসে।

—দেখ ত খুতুর-বাপ, যুবরাজ সারাদিন খাটা-খাটুনি করে এসে কোথায় আরাম করে শোবেন, তা না, চাঁদটা জানালা দিয়ে এসে বিরক্ত করছে।

খুতুর-বাপ তখন মস্ত বড় একটা লাঠি নিয়ে এল। রাজার ঘরের জানালা ত ছোটখাট নয়। তারপর ঠেলেঠুলে জানালা বন্ধ করে দিল।

যুবরাজ রূপার খাটে গা এলিয়ে দিলেন।

—নাঃ, ঘুম আসে না।

যুবরাজ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করেন।

হয়েছে কি, জানালার ফাঁক-ফুকর দিয়ে, দরজার পাশ দিয়ে চাঁদটা এসে যুবরাজের ঘরে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। যুবরাজ চাঁদের কাণ্ড দেখে রেগে আগুন।

যুবরাজের সমস্ত রাত ঘুম হল না।

পরদিন সকালে যুবরাজ এসেই ডাকলেন,—মন্ত্রি।

রাজ্যের ছোট-মন্ত্রি এসে হাজির।

যুবরাজ বললেন,—বুড়ো মন্ত্রি কোথায় ?

—তিনি তো রাজামশাইয়ের সঙ্গে তীর্থে গেছেন।

—তাহলে ছোট-মন্ত্রি, তুমিই একটা ব্যবস্থা কর।

—কি হল যুবরাজ ?

কাল সারাদিন খেটেখুটে শুতে গেছি, কোথায় আরাম করে ঘুমোব, তা না, চাঁদটা সারারাত বিরক্ত করেছে। জানালা বন্ধ করে দেওয়া হল, তবু একবার দরজার পাশ দিয়ে, একবার জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে আমাকে সমস্ত রাত ঘুমোতে দেয়নি।

—তাই ত যুবরাজ, আপনার খুবই কষ্ট হয়েছে, ছোট-মন্ত্রি বলেন।

—চাঁদের বড় অহঙ্কার, ওর দেশে অনেক সোনা-রূপা কিনা! দেখ না, এতদূর থেকেও দেশটা কেমন ঝলমল করে।

সেনাপতি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুবরাজের কথা শুনে বললেন, যুবরাজ, চলুন চাঁদের সব সোনা-রূপা কেড়ে আনি।

—আমিও তাই চাই। যদি চাঁদের দেশটা জয় করে সব সোনা-রূপা কেড়ে আনতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়।

—কিন্তু যুবরাজ, এতদূর দেশে যাবেন কি করে ? ছোট-মন্ত্রি বললেন।

সারাটা পৃথিবী জুড়ে আমার রাজ্য। এমন একজন কারিগর নেই আমার রাজ্যে, যে অল্পদিনে আমাকে সুন্দর একটা পুষ্পক-রথ তৈরী করে দেবে ?

—যুবরাজ, রাজ্যে অনেক ভাল ভাল কারিগর আছে।

যুবরাজ বললেন,—তবে ?

—শুধু কারিগর হলেই ত এ রথ তৈরী হবে না। অনেক অনেক টাকাও ত চাই।

যুবরাজ হেসে বললেন,—টাকা ? রাজভাণ্ডারে জমান টাকা আছে কি করতে ? চাঁদ আমাকে জয় করতেই হবে।

সেনাপতি বললেন,—ঠিক বলেছেন যুবরাজ।

যুবরাজ বললেন,—ছোট-মন্ত্রি কারিগরদের খবর পাঠাও তাড়াতাড়ি, আমার জন্য পুষ্পক রথ তৈরী করে দিক।

—যুবরাজ, ছোট-মন্ত্রি কিন্তু-কিন্তু করেন।

যুবরাজ বললেন,—কি হল ?

—যুবরাজ, তা কি করে হবে ? প্রতিদিন দেশের অসুস্থ অনাথ-আতুরদের রাজভাণ্ডার থেকে অল্প অল্প করে দান দেওয়া হয়।

যুবরাজ ভীষণ রেগে গিয়ে মন্ত্রিকে থামিয়ে দিলেন,—সকলকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দাও। আমার চাঁদ জয় সবচেয়ে আগে। সেনাপতি, ছোট-মন্ত্রিকে দিয়ে কিছু হবে না, তুমিই আমার সারা রাজ্য থেকে বেছে বেছে কারিগর ডেকে আন। তাড়াতাড়ি পুষ্পক রথ তৈরী করুক। আর ছোট-মন্ত্রি তুমি প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, রাজভাণ্ডার থেকে আর কেউ কোন দান পাবে না, সে যতই দুঃখী হোক না কেন।

সেনাপতি সারা রাজ্য ঘুরে তিনজন বাছা-বাছা কারিগর নিয়ে এলেন। কারিগররা কিছুতেই আসতে চায় না, যুবরাজের কাণ্ড দেখে তারা খুবই দুঃখ পেয়েছে। সেনাপতি তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসেন। প্রাণের ভয়ে, শাস্তির ভয়ে তারা কাজ করে। পুষ্পক রথ তৈরী হয়।

যুবরাজ আর সেনাপতি চাঁদের দেশে রওনা হয়ে যান। একদিন দুদিন, তিনদিন রথ যায়। মেঘের রাজ্য পার হয়ে, কুয়াশার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে রথ এগোয়। সাতদিনের দিন রথ চাঁদের দেশে পৌঁছয়।

সারা আকাশে ভেসে-ভেসে, খেলতে খেলতে দূর থেকেই চাঁদ যুবরাজ আর সেনাপতিকে আসতে দেখছে।

যুবরাজ আর সেনাপতি পৌঁছবার আগেই সে হাজির হয়ে যায় নিজের রাজ্যে। ছুট্টে ঢুকে পড়ে নিজের রূপার তৈরী পাহাড়ের গুহা-ঘরে। ডাক দেয়,—ও যাদু খরগোশ, যাদু খরগোশ, চলে এস, তাড়াতাড়ি চলে এস। বল ত, যুবরাজ রণবীর আমার চাঁদের দেশে

আসছেন কেন ?

যাদু-খরগোশ এসেই, মন্ত্র পড়তে পড়তে সারা গুহা ঘুরে ঘুরে নেচে নেয়,—ঝিকিম্-ঝিকিম্, ঝিকিম্-ঝিকিম্। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে—

আনমান, চানমান, চুক্,
রাজার সোনা-রূপার ভুক ॥

বলেই, আবার নাচতে থাকে ঝিকিম্-ঝিমক্, ঝিকিম্-ঝিকিম্। নাচের তালে তালে সমস্ত চাঁদের আলো কাঁপে তির্তির্ করে।

চাঁদ বলল,—আমার সমস্ত দেশটাই সোনার, পাহাড়গুলো রূপার। যুবরাজ রণবীর এবারে যতটা পারে সোনা-রূপা নিয়ে দেশে ফিরবে। কিন্তু সে আবার আসবে, কিছুদিন পর আবার ও আসবে। যাদু খরগোশ, যুবরাজ ভীষণ লোভী। কি করব ?

নাচ থামিয়ে খরগোশ বলে,

রাজার মাথায় মারব চাঁটি,
সোনারূপা হোক পাথর মাটি।

যেই না বলা, ব্যস, কোথায় রইল সোনা আর কোথায় রইল রূপা! সব সোনা হল মাটি, রূপার পাহাড় হল পাথর।

এদিকে যুবরাজ আর সেনাপতি সারা চাঁদের রাজ্যটা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় সোনা, কোথায় রূপা ? ওরা চাঁদের দেশ তন্ন তন্ন করে খোঁজেন, পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছুটে বেড়ালেন, মাসের পর মাস ধরে খোঁজেন—নাঃ, শেষ পর্যন্ত যুবরাজ আর সেনাপতি হয়রাণ। কিছুই পান না। যুবরাজ বলেন,—সেনাপতি, দেশটা যে শুধু পাথর আর মাটির। কোথাও ত এক কণা সোনা-রূপা দেখছি না, এক কাজ করা যাক।

সেনাপতি বলল,—কি যুবরাজ ?

—চাঁদের দেশের মাটি আর পাথর নিয়েই চল ফিরে যাই। হয়তো এ মাটি আর পাথরের মধ্যেই অনেক সোনা ও রূপা আছে আমরা বুঝতে পারছি না।



যুবরাজ বলেন,—সেনাপতি, দেশটা যে শুধু পাথর আর মাটির। কোথাও ত এক কণা সোনা-রূপা দেখছি না, এক কাজ করা যাক। পৃষ্ঠা ৮৭

সেনাপতি বলল,—তাই চলুন যুবরাজ। অনেক, অনেক দিন হয়ে গেল আমরা এদেশে এসেছি।

চাঁদের দেশের মাটি আর পাথর নিয়ে যুবরাজ ও সেনাপতি পুষ্পক রথে করে ফিরে চলেন।

তীর্থ শেষ করে, রাজ্যের নানা জায়গা ঘুরে রাজা ও বুড়ো মন্ত্রি অনেক দিন আগেই ফিরেছেন।

রাজভাণ্ডারের দান বন্ধ। রাজ্যে দুঃখী লোকেরা খেতে পায় না, অসুস্থ লোক ওষুধ পায় না। রাজা তাঁর রাজ্যে নানা জায়গা ঘুরে বেড়াতে গিয়ে সে সব খবর পেয়েছেন।

রাজা ফিরে এসেই ছোটমন্ত্রিকে ডেকে পাঠালেন,—ছোটমন্ত্রি, রাজভাণ্ডারের দান বন্ধ কেন?

ছোটমন্ত্রি ভয়ে ভয়ে বলেন,—মহারাজ, যুবরাজ ও সেনাপতি পুষ্পক রথে করে চাঁদ জয় করতে গেছেন। পুষ্পক রথ তৈরীর জন্য অনেক টাকার দরকার ছিল। তাই রাজভাণ্ডারের দান বন্ধ করে দিতে যুবরাজ আদেশ দেন।

রাজা বললেন,—মন্ত্রি, রাজভাণ্ডারে যা আছে তাই দিয়েই আজ থেকে আমার দুঃখী প্রজাদের দান দেওয়া আরম্ভ করুন।

রাজা রাজবাড়ীতে যা টাকা, সোনাদানা ছিল সব এনে রাজভাণ্ডারে দিয়ে দিলেন।

যুবরাজ আর সেনাপতি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন চাঁদের মাটি আর পাথর।

রাজা বললেন,—যুবরাজ রণবীর, কত সোনারূপা পেলে?

যুবরাজ বললেন,—আমি চাঁদে সোনারূপা খুঁজে পাইনি। তাই ওদেশের মাটি আর পাথর নিয়ে এসেছি, এগুলো নিশ্চয়ই সোনারূপা।

রাজা হাসলেন, দেশের বড় বড় সোনার কারিগরদের ডেকে

পাঠালেন।

তারা এসে চাঁদের মাটি আর পাথর ভাল করে দেখল,—মহারাজ, এ পাথর রূপাও নয়, এ মাটিও সোনা নয়।

যুবরাজের খুব মন খারাপ।

সন্ধ্যার সময় রাজা যুবরাজকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে এলেন। সুন্দর জ্যোছনায় চারদিক আলোয় আলো। পাকাধানে মাঠ ভরে গেছে। যেন সোনার ছড়াছড়ি।

যুবরাজ সেদিক তাকিয়ে বললেন,—আরে, আরে, এই ত এখানে এত সোনা।

রাজা বললেন,—ঠিক বলেছ। এসব সোনাই কিন্তু আমাদের প্রজাদের। বড় কষ্ট করে তারা।

যুবরাজ লজ্জায় মাথা নীচু করলেন,—বাবা, আমি আর কখনও তাদের দুঃখ দেব না।

রাজা বললেন,—আকাশের দিকে চেয়ে দেখ।

যুবরাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। চাঁদ হাসছে।

যুবরাজ বুঝলেন, এ হাসি তাকে বিরক্ত করার জন্য নয়, এ হাসি অহঙ্কারেরও নয়। এ হাসি অনেক আদরের। এ হাসি আশীর্বাদ।

যুবরাজের হাতেই ছিল চাঁদের মাটি আর পাথর, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি নদীতে,—দূর যা——।

দুষ্টু খরগোশ

একবার সারা বছর বৃষ্টি হল না। জঙ্গলে না আছে ঘাস, না আছে ফল-ফুল। ধারে কাছে সব পুকুর ডোবা শুকিয়ে গেল। নদী-নালাতেও জল নেই। জল পায় না, খেতে পায় না পশুরা সব মরমর। তখন সব পশুরা মিলে একটা সভা করল।

সভায় পশুরাজ সিংহ এলেন, এলেন বনের সেনাপতি বাঘ, মন্ত্রি ভাল্লুক। তাছাড়া চিতা, নেকড়ে, শেয়াল, হরিণ, বাঁদর সব্বাই এসে জড়ো হল।

—জল খেতে না পেলে আমি আর বাঁচব না। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস টেনে টেনে পশুরাজ সিংহ বললেন।

—আমিও। জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে বাঘ বলল।

মন্ত্রি ভাল্লুক এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার বলল,—মহারাজ, কষ্ট শুধু আমার আপনার নয়, কষ্ট সবার।

—হ্যাঁ মহারাজ, মন্ত্রিমশাই ঠিক বলেছেন। আমাদের সকলেরই বড় কষ্ট হচ্ছে। খাবারও চাই কিন্তু জল চাই সবার আগে, জল ছাড়া আর আমরা পারছি না। বলে উঠল চিতা, নেকড়ে, হরিণ, বাঁদর সকলে একসঙ্গে।

পশুরাজ বললেন,—মন্ত্রি উপায় ?

মন্ত্রি ভাল্লুক বললেন,—একটি মাত্র উপায় আছে, আসুন আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে মাটি খুঁড়ি। মহারাজ, মাটির নীচে জল আছে। একটা কুয়ো খুঁড়লে আমরা সব্বাই জল পাব।

সব জন্তু বলে উঠল—মন্ত্রিমশাই, ঠিক কথাই বলেছেন মহারাজ! আসুন আমরা সবাই মিলে কুয়ো খুঁড়ি।

মন্ত্রি বললেন,—মহারাজ, শুধু জল হলেই ত হবে না। গাছপালাও ত সব শুকিয়ে গেছে।



কিরে? চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস এখনও?

সেনাপতি বাঘ বললেন,—গাছপালা, ঘাস এসব দিয়ে আমাদের কি হবে?

মন্ত্রি বললেন,—তা ঠিক আপনারা মাংস খান কিন্তু যিনি রাজা তাঁকে ত সবার কথাই ভাবতে হয়। তা না হলে রাজাকে সবাই ভালবাসবে কেন?

পশুরাজ সিংহ বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ মন্ত্রি। ঘাস, গাছ-পাতা, ফল এসব চাই বৈকি। তার জন্য কি করতে হবে মন্ত্রি?

মন্ত্রি বললেন,—কুয়োতে যদি জল বেশী পাওয়া যায় তবে তা থেকে কিছু জল দিয়ে চাষও হবে।

হাতি, হরিণ, নীলগাই:এরা সবাই রাজা আর মন্ত্রির কথা শুনে ত খুব খুশী।

শুরু হল কুয়ো খোঁড়া। পশুরাজ নিজেই এ কাজে হাত লাগালেন। ভাল্লুক মন্ত্রি, সেনাপতি বাঘ সব্বাই মিলে একটা জায়গা খুঁড়তে শুরু করল। ওদের সঙ্গে শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে, হরিণ, হাতি, বাঁদর বনের সব, সব প্রাণী যার যেমন সাধ্য কাজ করতে লাগল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কুয়ো খোঁড়া হয়। সবাই কাজ করে।

খরগোশ কিন্তু ধারে কাছেই ঘেঁসে না। সে সারাদিন নিজের মনে ঝোপের মধ্যে লুকোচুরি খেলে।

সবার চেষ্টায় কয়েকদিনের মধ্যেই মাটির নীচ থেকে হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে এল। সুন্দর কুয়ো তৈরী হল।

সবাই এবার মনের আনন্দে জল খাবে ভাবছে। ওমা, কোথা থেকে খরগোশ ছুটে এসে সবার আগে জল খেতে শুরু করে দিল। সব পশুরা ত খরগোশের কাণ্ড দেখে অবাক। নেকড়ে ত এত রেগে গেল যে খরগোশকে এই মারে কি সেই মারে। পশুরাজ সিংহ অনেক কষ্টে তাকে আটকালেন। বললেন,—আরে, ওটা একেবারে বাজে আর ছোট্ট প্রাণী, ওকে মেরে কি হবে।

নেকড়ে পশুরাজের কথায় চুপ করে রইল।

এরপর সব পশুরা মিলে কুয়োর জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে নানা রকম গাছ লাগাল, ঘাসগুলো যাতে বড় হয় তার চেষ্টা করতে লাগল, কিছু কিছু জায়গায় আবার ওরা ভুট্টাও ফলাল।

খরগোশ কিন্তু এবারও তাদের সঙ্গে কাজ করতে এল না। উল্টো উঁচু টিপিটাতে ডিগবাজি খেতে খেতে সবাইকে ঠাট্টা করল।

কিন্তু যেই না ভুট্টা পাকল, ঘাসগুলো বড় হল, সুন্দর সবুজ হল ওমনি সবার আগে এসে হাজির। আর এসেই সাত তাড়াতাড়ি সবুজ ঘাস খেতে শুরু করে দিল।

এবার কিন্তু শুধু নেকড়ে নয়, হরিণ, চিতা, ঘোড়া, গরু, কুকুর সবাই রেগে পশুরাজকে বলল,—আমরা আর খরগোশের শয়তানি সহ্য করব না। আমরা সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলব।

তখন পশুরাজ বললেন,—এবারের মত ওকে ক্ষমা করে দাও।

অন্য সব পশুরা বলল,—আপনার আদেশ এবারের মত মেনে নিলাম। এরপরও যদি একদিনও খরগোশ কুয়োর জল খেতে আসে কিম্বা ঘাস, ফল, ভুট্টা খেতে আসে তবে কিন্তু আমরা সবাই মিলে ওকে মারবই।

সিংহ বললেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

তারপর খরগোশের দিকে ফিরে বললেন,—ওহে খরগোশ শোন, এই নিয়ে দুদিন তোমাকে ক্ষমা করা হল, এরপর যদি তুমি আমাদের কুয়োতে জল খেতে আস তবে তোমাকে মেরে ফেলা হবে। তোমাকে যখনই কোন কাজ করতে বলা হয় তখনই তুমি পালিয়ে যাও, তা হবে না। হয় আমাদের সকলের সঙ্গে কাজ কর নয় মর।

খরগোশ বেশ খোশমেজাজে বলল,—আমার জল আর খাবারের কিচ্ছু দরকার নেই। বলেই সে ফিক্-ফিক্ করে হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেল।

সকালবেলা সবাই যখন ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত পশুরা দেখল শুকনো পুকুর পাড়ে খরগোশ মনের আনন্দে নাচগান করছে।

এদিকে হয়েছে কি, সারাদিন খাটাখাটুনীর পর রাত্রি হলেই পশুরা সব ঘুমিয়ে পড়ত। আর তখন না খরগোশ উঠে চুপি চুপি চলে আসে কুয়ো পাড়ে, মজা করে খুব চান করে, পেট ভরে জল খায়, ক্ষেতে ঢুকে ঘাস খায়, ফল খায়। যত না খায় তার চেয়ে বেশী নষ্ট করে। আর সকাল হতেই ঝোপের ভিতর ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে। তার এসব কাজ কেউ দেখতেও পায় না। সকালে ক্ষেতের অবস্থা দেখে পশুরা হায়, হায় করে। শেষে কয়েকদিন পর হাতি বলে,—আজ থেকে রোজ রাত্রে একজন করে আমরা ক্ষেত পাহারা দেব। আমাদের এত কষ্টের ঘাস, ফল কে নষ্ট করছে? ধরতেই হবে।

সবাই বলল,—ঠিক্-ঠিক্, হাতি মশাই ঠিক কথাই বলেছেন।

সেদিন রাতে শেয়াল রইল পাহারায়। রাত বাড়তে থাকে। শেয়াল কয়েকটা গাছের আড়ালে চুপ করে আধশোয়া অবস্থায় বসে রইল।

হঠাৎ ক্ষেত্রের মধ্য থেকে খচর-মচর আওয়াজ। শেয়াল আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল। গাছের পিছন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, —একি কাণ্ড খরগোয়টা বেশ মজা করে পেট পূজা করছে, কখনও ঘাস খাচ্ছে, কখনও ফল খাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে কুয়ো থেকে জল খেয়ে আসছে। আর কত যে নষ্ট করছে তা বলার নয়।

শেয়াল কিন্তু কিছুটি বলে না। সব দেখে শুনে সকালবেলা পশুরাজের কাছে গিয়ে হাজির।

শেয়াল বলে,—মহারাজ, আমাদের ক্ষেতের ঘাস, ভুট্টা, ফল রাত্রিতে যে খায় আর নষ্ট করে সেই চোরকে আমি কাল রাতে দেখেছি।

পশুরাজ সিংহ বলেন,—কে সে?

শেয়াল বলে,—খরগোশ। রাতে যখন আমরা সবাই ঘুমাই সেই সময় আপনার মানা করা সত্বেও সে বেশ মজা করে কুয়োর জল খায়,

ক্ষেতের ঘাস, ভুট্টাও খায়।

হরিণ বলে,—অথচ কাজ করতে বললেই মুখ ভেংচায়। বলে,—তোরা খেটে খা, তোরা কুলি মজুর। আমার খেটে খেতে হয় না আমি রাজা বাদশা আমার খাবার এমনি জোগাড় হয়।

হাতি শুনে রেগে-মেগে বলে,—এখনই ওটাকে পা দিয়ে পিষে ফেলব।

পশুরাজ সিংহ বলেন,—হাতিভাই, তুমি এত বড় প্রাণী ঐ ছোট্ট একটা জন্তুর কথায় তোমার একদম রাগ করা উচিৎ নয়। তাছাড়া দেখছই ত খরগোশটা এত বোকা যে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেও জানে না।

মন্ত্রি ভাল্লুক সব শুনেটুনে বলল,—মহারাজ, ওকে শাস্তি দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজই নয়। কিন্তু ওকে শাস্তি দেবার আগে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখলে হয় না। এমন কেউ নেই আমাদের মধ্যে যে এ কাজের ভার নিতে পারে ?

বাঁদর একদিকে চুপ করে বসেছিল। মন্ত্রিমশায়ের কথা শুনে বলল,—মহারাজ মজার, মজার কাজ করতে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। যদি আমাকে একাজের ভার দেন ত আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পশুরাজ বললেন,—ঠিক আছে, বাঁদরভায়া কাজে লেগে যাও।

পরদিন বাঁদর গাছে গাছে, লাফিয়ে লাফিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে একটা রং-আলকাতরার কারখানার কাছে চলে এল। রাতের অন্ধকারে সেখান থেকে একটা আলকাতরার টিন উঠিয়ে নিয়ে এল জঙ্গলে। সঙ্গে সঙ্গে না জানি কি করে একটা পুরোন পাজামা, সার্ট আর টুপিও জোগাড় করল। তারপর বাঁদর ক্ষেতের পাশে দুটো মোটা মোটা লাঠি পুঁতল। লাঠিদুটোকে পাজামা পরাল, সার্ট পরাল, সব শেষে লাঠির মাথায় টুপি পরিয়ে সুন্দর পাহারাদার তৈরী করল। এবার করল কি, বেশ মোটা করে আলকাতরা লাগিয়ে দিল

পাহারাদারের সারা গায়ে। রাতের অন্ধকারে কিছুই বোঝা যায় না, শুধু মনে হয় একটা কালো মূর্তি ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে।

বনে এসে সবাইকে ডেকে ডেকে বলল,—ভাই সব, আজ রাতে যারা যারা খরগোশের তামাশা দেখতে চাও শীগ্‌গির এস, তবে একটু চুপচাপ আসবে আর লুকিয়ে থাকবে।

মজা দেখার আনন্দে আর কারু সবুর সয়, যেই না একটু রাত বেশী হয়েছে সবাই চলে এল আর লুকিয়ে বসে রইল।

ঠিক তখন অর্ধেক রাত। আকাশে ফিকে ফিকে জ্যোছনা। খরগোশ ধীরে সুস্থে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাজার চালে হেলেদুলে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ক্ষেতে এসে হাজির।

—নাঃ, কেউ কোথাও নেই। যাই এবার পেট ভরে খাই। কিন্তু এটা কি? এটা কে রে বাবা? এই কালো কুচ্‌কুচে লোকটা এখানে এল কোথা থেকে?

খরগোশ খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর ধমকে ওঠে, —এই, এই তুই কে রে? আমার ক্ষেতে ঢুকে ফসল খাচ্ছিস কেন? যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস এখনই চুপচাপ চলে যা এখান থেকে না হলে··· —বলতে বলতে খরগোশ কা ছাকাছি একটা ঝোপে ঢুকে গেল। ভয় করতে থাকে ওর যদি কালো লোকটা তাকে মারতে দৌড়য়।

—কিন্তু একি? খরগোশ আবার বের হয়।—এটা কেমন লোক? নড়ে না, চড়ে না, কিছু বলেও না? ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

ও একটা ঢিল ছুঁড়ল কালো লোকটার উপর। ঢিলটা ঠিক লোকটার মাথায় লাগল, কিন্তু কিছুই হল না লোকটার। খরগোশ আশ্চর্য হল। আবার একটা ঢিল ছুঁড়ল খরগোশ। লোকটার গায়ে সেটা খুব জোরে লাগল। কিন্তু,—একি, কালোমূর্তিটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে যে।

এবার খরগোশের ভীষণ রাগ হল। সে চিৎকার করে বলে উঠল,

—এই শয়তান, তোর চুপ করে থাকা দেখাচ্ছি। তুই আমার ক্ষেতে এসেছিস কেন? যদি প্রাণে বাঁচতে চাস ত শীগ্‌গির চলে যা।

খুব কাছে চলে আসে খরগোশ।

—কি রে, চুপ করে আছিস এখনও? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা, বলেই দুপায়ে দাঁড়িয়ে খুব জোরে একটা ঘুসি লাগাল কালো লোকটার পেটে।

—একি, একি আমার ঘুসিটা যে চেপে ধরছে লোকটা, ছাড়াতে পারছি না যে। দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি, আমার ঘুসি চেপে ধরা। বলেই লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে খরগোশ। ব্যাস্ আর যায় কোথা। খরগোশ একদম কালো লোকটার সঙ্গে সেঁটে গেল। যত চেষ্টা করে ছাড়াবার ততই জড়িয়ে যায়। কি মুস্কিল!

খরগোশ ত জানে না কালো লোকটা আসলে আলকাতরা দিয়ে তৈরী। খরগোশের অবস্থা তখন কাহিল। বেচারা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সবাইকে ডাকতে লাগল,—আমাকে কালো ভূতে ধরেছে। কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও। আমি মরে যাচ্ছি। শীগ্‌গির এস, আমাকে বাঁচাও।

চারদিকে সব পশুরা ত মজা দেখার জন্য লুকিয়েছিল। ওরা খরগোশের কাণ্ড দেখে হেসেই কুটিপাটি।—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

সবাই লুকিয়ে হাসছে। খরগোশ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ও ভাবল নিশ্চয় ভূতই হাসছে। ও আরও ভয় পেয়ে গেল। ও চিৎকার করে বলল,—ভূত, ভূত, আমি মরলাম, আমাকে বাঁচাও।

খরগোশের ভয় দেখে সবার আরও হাসি পাচ্ছে। —হিঃ, হিঃ, হিঃ। ওরা একসঙ্গে বিকট গলা করে বলে,—আমরা ভূত, তুই যে অন্যায় করেছিস এবার তার শাস্তি ভোগ কর। তুই তোর বন্ধুদের কষ্ট দিয়েছিস কেন? সবাই যখন কুয়ো খুঁড়ছিল, ক্ষেতে চাষ করছিল তখন তুই পালিয়ে গিয়েছিলি কেন? এখন চুরী করে খুব জল খা, ঘাস, ফল খা। এবার মজা দেখ। আমরা সবাই তোর ঘাড় মটকে খাব।

খরগোশ ভয়ে কাঠ। কাঁপতে কাঁপতে বলে,—এবারের মত

আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কখনও এমন করব না। সব সময় আমার বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করব। কখনও দুষ্টুমী করব না। ও ভাই ভূতরা আমাকে দয়া কর।

তখন সকাল হয়ে এসেছে। খরগোশ তখনও কালো মূর্তিটার সঙ্গে আটকে আছে।

পশুরাজ সিংহ সব পশুদের বললেন,—খরগোশের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তারপর বাঁদরের দিকে চেয়ে বললেন,—এবার ওকে আলকাতরা থেকে ছাড়িয়ে দাও। পশুরাজ, অন্য পশুদের কিন্তু এখনই খরগোশের কাছে যেতে মানা করেন।

বাঁদর এগিয়ে এসে বলল,—কি খরগোশ ভায়া, ক্ষেতে কি করছিলে? মনে হচ্ছে তুমি সারা রাত যুদ্ধ করেছ।

—আরে, আরে, একি তুমি যে এই কালো পাহারাদারটার গায়ে একদম আটকে গেছ। হাতেনাতে ধরা পড়েছ ত? এবার বল, তোমার কি শাস্তি হওয়া উচিত?

খরগোশ লজ্জায়, কষ্টে কোন কথাই বলতে পারে না। গোঙাতে, গোঙাতে বলে,—আমার খুব শাস্তি হয়েছে। তোমার পায়ে ধরি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর এই কালো ভূতের হাত থেকে ছাড়িয়ে আমাকে বাঁচাও। এবার থেকে আমাকে যা বলবে তাই করব।

বাঁদর বলে,—পায়ে যদি ধরতে হয়, ক্ষমা যদি চাইতে হয় তবে সব পশুদের কাছে চাইতে হবে।

তখন খরগোশ চিৎকার করে বলল,—কোথায় আছ, বনের বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি। আর প্রতিজ্ঞা করছি আমি সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকব। কাজের সময় পালিয়ে যাব না, দুষ্টুমী করব না।

আর কি, সব পশুরা এক এক করে বের হয়ে খরগোশের কাছে এল। সবাই মিলে খরগোশকে আলকাতরা থেকে ছাড়িয়ে দিল। তারপর গান করতে করতে নাচতে নাচতে যে যার বাড়ীর পথে রওনা হল।

নীলপদ্মের জন্মকথা

হিমালয়ের বরফে ঢাকা অনেকগুলো বড় বড় চূড়া যেখানে ভীড় করে আছে ; সেই, সেইখানে পাহাড়ের চূড়াগুলোর গোড়ায় বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। আর সেইখানে এক বিরাট সরোবর। সেই সরোবরে পদ্মরাজার রাজত্ব।

সেযুগে পদ্মফুলের জীবন ছিল একটু অন্যরকম। তাদের পাপড়ি এত সহজে ঝরে পড়ত না, বেশ কয়েক বছর তারা বেঁচে থাকত। আর তাদের ফুলের মত পাতা ও ডাটাগুলোও ছিল অপূর্ব, মসৃণ সবুজ, যেন এক এক টুকরো সবুজ ভেলভেট।

সেই পদ্মফুলের রাজ্যে কত রকমের পদ্মফুল,—ছোট, বড়, কেউ লাল, কেউ সাদা। কিন্তু সব থেকে সুন্দর রাজকন্যা শুভ্রমণি। পদ্ম-রাজের একমাত্র মেয়ে। সুন্দর সাদা তার প্রত্যেকটা পাপড়ি, ভিতরে হলুদ কেশর। আর কি সুন্দর গন্ধ তার প্রত্যেকটি পাপড়িতে।

ভারি মিষ্টি স্বভাব রাজকন্যার। সব্বাই তাকে খুব ভালবাসে, দেখলেই খুশি হয়।

ছোটবড় পাখিরা জলের ধারে এলেই রাজকন্যা মাথা নেড়ে নেড়ে সকলকে নমস্কার জানায়। পাখিরাও তাকে দেখলেই আনন্দে নানা সুরে গান ধরে। প্রজাপতি, মৌমাছিরা রাজকন্যার কাছে এলে ত, শুভ্রমণি খুশিতে তার প্রত্যেকটি পাপড়ি মেলে তাদের বুকের মধ্যে তুলে নেয়।

পদ্মরাজের কিন্তু মহাচিন্তা রাজকন্যার জন্য,—এত সুন্দর কন্যার তিনি বর খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর রাজ্যে সাদা, লাল কত পদ্ম কিন্তু রাজকন্যা শুভ্রমণির ধারে কাছেই কেউ দাঁড়াতে পারে না। যদি বা কেউ সাহস করে এগিয়ে আসে কিন্তু রাজকন্যাকে দেখেই সে নিজেই

লজ্জায় পালায়। পদ্মরাজ রাজকন্যার উপযুক্ত বর আর খুঁজে পান না।

দিন যায়, পদ্মরাজ চিন্তিত হন, পদ্মরাণী কাঁন্নাকাটি করেন। রাজকন্যা শুভ্রমণি বাবামার কষ্ট দেখে দুঃখ পান। রাজকন্যার চোখে জল দেখে পাখিরা, মৌমাছিরা প্রশ্ন করে,—কি হল? কি হল?

সব শুনে বলে,—তাইত, তাইত।

পাখিরা, মৌমাছিরা এমন কি প্রজাপতিরাও দূর-দূরান্তে চলে যায়। কিন্তু,—নাঃ, কেউ রাজকন্যা শুভ্রমণির উপযুক্ত বর খুঁজেই পায় না।

এদিকে হয়েছে কি একদল গাছ, লতা, পাতার বৈজ্ঞানিক যাদের বলে উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক, এলেন পাহাড়ে জঙ্গলে নানা নতুন গাছপালা খুঁজতে। তাঁরা এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে পদ্মরাজার রাজ্যের উল্টো দিকে, পাহাড়ের কোল ঘেঁসে দেখতে পেলেন একটি সুন্দর পুকুর। তাঁরা দেখলেন সেই পুকুরে অনেক সাদা আর লাল পদ্মের মধ্যে একটি সুন্দর নীলপদ্ম ফুটে আছে। তাঁরা ত জানেন না,—ইনি এই পদ্মরাজ্যের রাজপুত্র, কুমার নীলকমল।

তাঁরা নীলপদ্ম দেখে ভারি খুশি। তাঁদের একজন বললেন,—বাঃ, বাঃ, দেখ, দেখ কি সুন্দর নীলপদ্মটি। এটা শিকড়শুদ্ধ তুলে নিয়ে যেতে হবে।

অন্য আর একজন বললেন,—ঠিক, ঠিক এ ফুলটি নিয়ে গেলে আমরা সবাইকে একটি আশ্চর্য জিনিস দেখাতে পারব।

আর বলেই না তাঁরা রাজপুত্র কুমার নীলকমলকে শিকড়শুদ্ধ তুলে নিয়ে এলেন নিজের তাঁবুতে। নানা ওষুধ দিয়ে একটি জলের বড় পাত্রে রেখে দিলেন। দেশে ফিরতে দেরী হবে যাতে নীলপদ্মটি নষ্ট হয়ে না যায়।

এসব ওষুধপত্রের জ্বালায় কুমার নীলকমলের শরীরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিকেরা ত রাজপুত্রের কষ্ট বুঝলেন না। চোখের জলও দেখতে পেলেন না। বরং নতুন জিনিস পাবার আনন্দে সবাই খেয়ে-

দেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন।

যে পাখিরা আর মৌমাছিরা শুভ্রমণির বব খুঁজতে বের হয়েছিল তারা এসব কাণ্ডকারখানা দেখল।

পাখিরা বলল,—দেখ এই কুমার নীলকমলই আমাদের রাজকন্যার উপযুক্ত বর।

মৌমাছিরা বলল,—ঠিক বলেছ, চল রাজপুত্র নীলকমলকে চুরি করে নিয়ে আমরা পালাই।

তখন চারজন পাখি তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ল। তারপর একসঙ্গে মিলে কুমার নীলকমলকে তুলে নিয়ে উড়তে উড়তে চলে এল শুভ্রমণি রাজকন্যার কাছে।

—রাজকন্যা, তোমার বর খুঁজে নিয়ে এসেছি। বলেই জলে ভাসিয়ে দিল নীলকমলকে।

রাজকন্যার বর এসেছে, বর এসেছে পদ্মরাজ্যে খুশির ঢেউ উঠল।

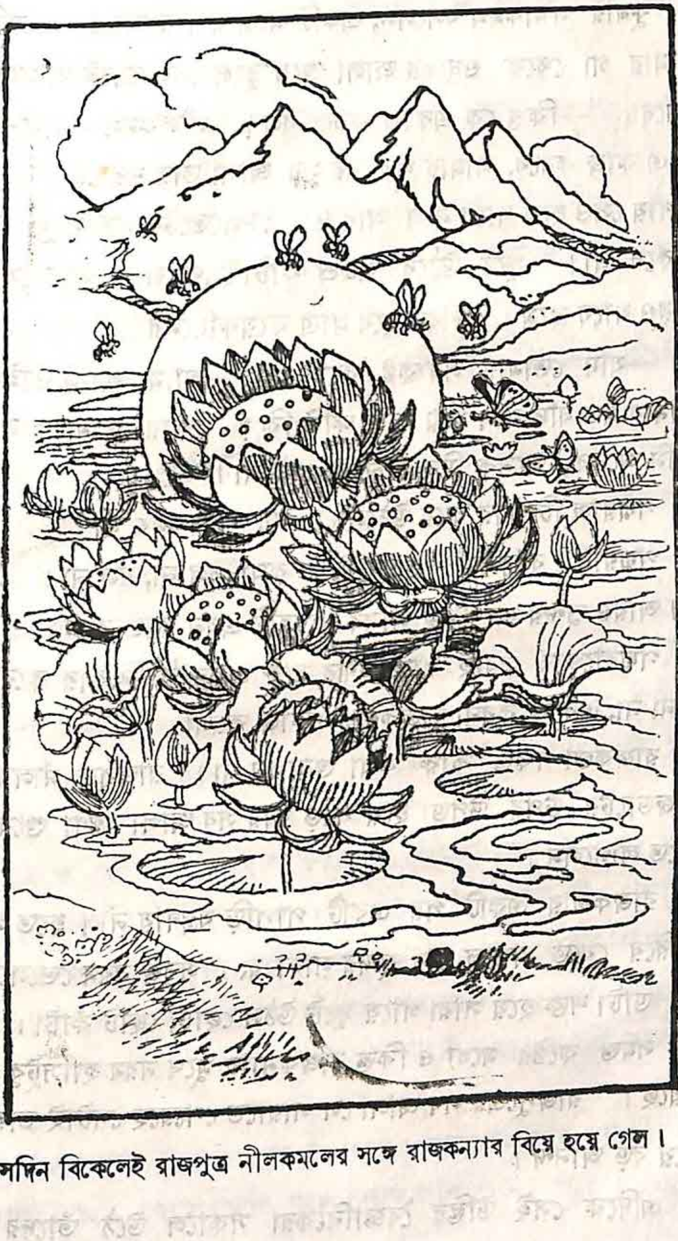
আনন্দে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। পদ্মরাজ ও পদ্মরাণীর কুমার নীলকমলকে দেখে খুব পছন্দ। তাঁরা পদ্মরাজ্যের সববাইকে, পাখিদের, মৌমাছিদের আর প্রজাপতিদের নেমন্তন্ন করে দিয়ে বললেন,—আজ বিকেলে যখন সমস্ত পৃথিবী লাল আলোয় ভরে যাবে, ঠিক তখনই রাজকন্যার বিয়ে। তোমরা সববাই আসবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু রাজকন্যা দেখেন রাজপুত্র নীলকমলের সবই সুন্দর, কিন্তু মুখটি বড় মলিন যেন খুব কষ্ট হচ্ছে।

রাজকন্যা আর থাকতে পারলেন না, চুপি চুপি রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

নীলকমল রাজপুত্র বললেন,—ঐ বৈজ্ঞানিকেরা আমাকে নানা ওষুধের জলে রেখে দিয়েছিল। সেই ওষুধের জন্য আমার সারা শরীর জ্বলছে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না রাজকন্যা। আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না।

রাজকন্যা শুভ্রমণির মনটি এমনিতেই নরম তার উপর রাজপুত্রের



সেদিন বিকেলেই রাজপুত্র নীলকমলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

কথা শুনে সে কেঁদেই আকুল। কাঁদতে, কাঁদতে বললেন,—রাজপুত্র, রাজপুত্র কি করলে তোমার সব কষ্ট কমবে ?

কুমার নীলকমল বললেন, একটি মাত্র উপায় আছে। যদি কেউ আমার গা থেকে ওষুধের জ্বালা শুষে তুলে নেয় তবেই আমার জ্বালা কমবে। —কিন্তু কে একাজ করবে বল ? নীলকমল বলেন,—কারণ যে এ কাজ করবে, আমার শরীরের সব জ্বালা তার শরীরে চলে যাবে। যন্ত্রণায় সেও হয়ে যাবে নীল আর তার ভেলভেটের মত সবুজ ডাটা ও থাকবে না। ফুঠে উঠবে অজস্র কাঁটা সেখানে। আর সেই সঙ্গে আয়ুও যাবে কমে। জীবন হবে মাত্র কয়েকদিনের।

—যদি তোমার সব কষ্ট কমে যায়,—আমি, আমি তাই করব। তোমার মত যদি নীল হয়ে যাই ক্ষতি কি ? আর তোমাকে না পেয়ে আমি অনেক, অনেক দিন বাঁচতেও চাই না।

পদ্মরাজ চিৎকার করে উঠলেন,—না, না কখনও না।

পদ্মরানী বললেন,—শুভ্রমনি, ও কথা, বল না, বল না। তোমার জন্য আরও সুন্দর বর খুঁজে আনব। তুমি এখন কাজ করনা।

পদ্মরাজ্যের সবাই রাজারাণীর সঙ্গে একসুরে চিৎকার করে উঠল, —না না, একাজ করনা রাজকন্যা, একাজ করনা।

রাজকন্যা কিন্তু কারু কথা শুনলেন না। রাজপুত্র নীলকমলের সবুজডাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার সব জ্বালা যন্ত্রণা শুষে তুলে নিতে লাগলেন।

রাজকন্যার একটি পর একটি পাপড়ি যন্ত্রণায় নীল হতে লাগল, হারিয়ে যেতে লাগল তার সুন্দর সাদা রং। সবুজ নরম ভেলেভেটের মত ডাটা শক্ত হয়ে সারা গায়ে ফুটে উঠল ছোট, ছোট কাঁটা।

সমস্ত কষ্টের মধ্যে ও কিন্তু রাজকন্যার মুখে নরম হাসিটুকু লেগে রয়েছে। রাজপুত্রের সব জ্বালা সে সারাতে পেরেছে সেটাই তার সব-চেয়ে বড় আনন্দ।

এদিকে সেই উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিকেরা সকালে উঠে তাঁদের ওষুধে

ভেজান নীলপদ্মটি খুঁজে পান না! তাঁরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন।

হঠাৎ পদ্মরাজের সরোবরের কাছে এসে দেখেন, একটি নয় দুটি সুন্দর নীলপদ্ম ফুটে আছে।

একজন বৈজ্ঞানিক সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে বললেন,—আমি এখনই নীলপদ্ম দুটি তুলে আনছি।

যেই না বলা, কাছেই একটি গাছের ডালে বসে ছিল টিয়া, চিৎকার করে বলে উঠল, —সবাই তাড়াতাড়ি এস, তাড়াতাড়ি এস, রাজপুত্র, রাজকন্যাকে বাঁচাও।

এই না শুনে অন্যান্য পাখিরা, মৌমাছিরা—বাঁচাও, বাঁচাও বলে ছুটে এল।

পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এসে করল কি, বৈজ্ঞানিকদের অনেক কষ্টে জোগাড় করা অদ্ভুত সব গাছ, পাতা আর নানা গাছের বীজ ছড়িয়ে, ছিটিয়ে ফেলে দিতে লাগল জলে। জঙ্গলে আর মৌমছিরা দলে দলে এগিয়ে এসে হুল ফোটাতে লাগল পুট্ পুট্ করে।

আর যে বৈজ্ঞানিক জলে নেমে ছিলেন তাঁকে ত একদল বড়, বড় মৌমাছি এমন কামড়াতে লাগল যে তিনি,—বাপরে, মারে বলে জল, থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। তারপর তাঁবুর দিকে ছুট, ছুট। মৌমাছির দল তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলল।

এদিকে এত কষ্টে জোগাড় করা সব জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না সেখানে। তাঁবুতে পৌছেই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তারা ফেরার জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

সেদিন বিকেলেই রাজপুত্র নীলকমলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। মৌমাছিরা ত গুন্-গুন্ করে সানাই বাজাতে শুরু করে দিল সকাল থেকেই। পাখিরা সবাই গান ধরল।

পূর্ণিমার রাত, চাঁদ ও রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে দেখে খুশিতে আকাশে ভেসে, ভেসে হেলে, দুলে শেষে থাকতে না পেরে পদ্মরাজার

সরোবরে এসে হাজির হলেন বরকনেকে আশীর্বাদ করতে।

কিছুদিন পর পদ্মরাজা ও পদ্মরাণী বুঝলেন এবার তাঁদের ঝরে পড়ার সময় হয়েছে। তাই রাজ্যের ভার তুলে দিলেন রাজপুত্র নীলকমলের হাতে।

রাজকন্যার আয়ু কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন থেকে সব পদ্মের আয়ু গেছে কমে।

তারপর, তারপর কত বছর কেটে গেছে। হিমালয়ে আজও যারা ঘুরে বেড়াতে আসেন তাঁরা দেখতে পান, বরফে ঢাকা পাহাড় ঘিরে রয়েছে একটি সুন্দর সরোবরকে। সেখানে একটিও লাল বা সাদা পদ্ম নেই।

সেখানে নীল জলে ফুটে আছে নীলকান্ত মনির মত অজস্র নীলপদ্ম।

রাজকন্যা পদ্মকলি

রত্নদ্বীপের রাজার সঙ্গে অচীনদেশের রাজার ভীষণ ঝগড়া। এ ঝগড়া যে কতদিনের কেউ বলতে পারে না। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পাড়ে অচীনদেশ তবু সেখান থেকে মাঝে মাঝে সৈন্য সামন্ত এসে রত্ন দ্বীপের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দেয়, লুটেপুটে নিয়ে যায়। ভীষণ লোভী অচীন দেশের রাজা। রত্নদ্বীপের মানুষ এযুদ্ধ চায়না, রত্নদ্বীপের সৈন্যসামন্তও অচীনদেশে যায় না।

রত্নদ্বীপের রাজার মনে সারাক্ষণ চিন্তা,—কি হয়, কি হয়! প্রজাদের মনে ভয়,—এই বুঝি সব লুটে নিল, মেরে ফেলল।

রত্নদ্বীপের রাজার একটি মাত্র আনন্দ,—রাজকন্যা পদ্মকলি। পদ্মফুলও লজ্জা পায় তার রূপে। যেখানে যায় চারদিকটা আনন্দে ভরে ওঠে। এমনি মিষ্টি তার স্বভাব।

রাজারাণী তাঁদের একমাত্র মেয়েকে সোনাদানা, হীরে জহরৎ, মণিমুক্ত দিয়ে সাজিয়ে রাখেন। রাজকন্যার কানে মণি, মুক্তার বালা, গলায় হীরের সাতলরী হার, সেই হারের মাঝখানে কমল হীরা—সাত রাজার ধন। সোনার কাজকরা লালটুকটুকে শাড়ী পরে থাকেন রাজকন্যা।

রত্নদ্বীপের সবাই পদ্মকলিকে খুব ভালবাসে। কিন্তু রাজকন্যার মনে শান্তি নেই, আনন্দ নেই। বাবা, মা আর রাজ্যের লোকেদের জন্য তার ভারি কষ্ট। সে সখীদের সঙ্গে খেলে না, গান করে না। সারাদিন জানলার ধারে বসে চুপ ভাবে আর ভাবে কি করে সবার কষ্ট তাড়িয়ে দেবে।

একদিন সখীরা জোর করে তাকে নিয়ে এল গোলাপ বাগানে। দোলনায় বসে দুলতে দুলতে রাজকন্যা বলল,—দেখ সখী, আমি অচীন দেশে যাব।

—সে কি ? মহারাজ তোমায় যেতে দেবেন কেন ?

—আমি ঠিক বাবার মত করাব। এই ত সেদিন সোনালী গ্রামের প্রজারা বাবার কাছে এসে কি কান্নাই কাঁদছিল। অচীন দেশের সৈন্যরা এসে তাদের গ্রাম লুট করেছে আর ঘরবাড়ী সব পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

—তুমি কি এসব বন্ধ করতে পারবে ?

রাজকন্যা জবাব দেবার আগেই হঠাৎ এল বৃষ্টি—রিমঝিম্, রিম্‌ঝিম রাজকন্যা আর সখীরা রাজবাড়ীর দিকে ছুট লাগাল, পায়ের নূপুর বাজল,—ঝম্‌ঝম্, ঝম্‌ঝম্। রাজকন্যার গলার মাতলরী হীরের হার দুলে উঠল। না জানি কেমন করে হারের মাঝের কমলহীরাটি ঝরে পড়ল,—টুপ। রাজকন্যা টেরই পেলেন না।

সকাল হল সূর্যের লাল আলোয় চারদিক ভরে গেল। ঘাসের শিশিরের ফোঁটাগুলোতে সেই আলো পড়ে মনে হতে লাগল যেন কেউ লাল চুন্নি ঘাসের উপর সাজিয়ে রেখেছে।

সাতরাজার ধন কমল হীরাটিও ঘাসের উপর পড়ে ছিল। তার উপর আলো পড়তেই চারদিক ঝল্‌মল্ করে উঠল।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল গোলাপকুমারেরা। সকালবেলা সূর্যকে দেখে তাদের ভারি খুশি। তারা দুলে দুলে এক সাথে গান জুড়েদিল।

হঠাৎ একজন বলল,—দেখ, দেখ ঘাসের উপর কত বড় কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে।

আর একজন গোলাপকুমার বলল,—তাইত, ওযে আমার থেকে সুন্দর তোমার থেকে সুন্দর, সবার থেকে সুন্দর। বাগানে এমন সুন্দর একটিও ফুল নেই।

কমলহীরা সব শুনছিল, অহংকারে আর খুশিতে আরও সুন্দর হচ্ছিল। শেষে থাকতে না পেরে বলল,—গোলাপকুমারেরা, আমি ফুল নই আমি হীরা, সাতরাজারধন—কমলহীরা।

গোলাপকুমারেরা বলল,—নমস্কার হীরা দাদা, কিন্তু এর আগে ত তোমাকে এখানে দেখিনি।



রাজকন্যা আর সখীরা রাজবাড়ির দিকে ছুট

কমলহীরা বলল,—আরে, আমাকে দেখবে কি করে; আমার থাকার জায়গা ত বাগান নয়, আমি রাজার মাথায়, নয় গলায় থাকি। ছিঃ, কি নোংরা মাটি আর ঘাস।

গোলাপকুমারেরা বলল,—তাইত, তাইত। তুমি কি করে এখানে এলে?

—আরে কাল বিকেলে ঝড় এল না। রাজকন্যা পদ্মকলি রাজবাড়ীর দিকে দৌড়াল, আমি ছিলাম রাজকন্যার হীরার হারের মাঝখানে। হার থেকে খসে এইখানে পড়লাম।

যদি রাজার কাছে এ খবর যায় যে আমি এখানে পড়ে আছি তা হলে কি কাণ্ড হবে জান?

গোলাপকুমারেরা বলল,—কি হবে? কি হবে?

—সারা রাজবাড়ী ছুটে আসবে এখানে। রাজা আসবেন, রাণী আসবেন, মন্ত্রি আসবেন, সব্বাই ছুট্টে আসবে।

—তারপর?

—তারপর, আমকে প্রণাম করে মাথায় করে নিয়ে যাবে। কত যত্নে সিন্দুকে ভরে রেখে দেবে।

এবার আর একজন গোলাপ বলল,—কমলহীরা দাদা, সত্যি আমাদের খুব ভাগ্য যে তোমার দেখা পেলাম। আচ্ছা, কমলহীরা দাদা, তোমার পাশে ঐ যে ছোট বড় লাল, নীল, হলুদ, সাদা আলোর মত সুন্দর অনেক ফুল ফুটে আছে ওরাও বুঝি হীরা?

—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ ওরা আবার হীরা হল কবে? ওরা ফুলও না, ওরা সেরেফ কিচ্ছু না। জল, জলের ফোঁটা, শিশির। সূর্যকে একটু সরে যেতে দাও না, ঐ রূপ আর থাকবে না।

শিশির সব শুনল কিন্তু কিচ্ছুটি বলল না।

কিন্তু গোলাপকুমারেরা রেগে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভারি অহংকার ত কমলহীরার।

এমন সময় একটা সুন্দর ছোট্ট পাখি এল বাগানে। গোলাপ-

কুমারেরা পাখিকে দেখে খুব খুশি।

—পাখি এস, এস। অনেক গান শোনাতে হবে কিন্তু আজ, সারাদিন।

পাখি কিন্তু একটা কথাও বলে না। চুপ করে বসে থাকে।

—পাখি তুমি কথা বলছ না কেন?

—আমি কথা বলতে পারছি না। আমার কষ্ট হচ্ছে। থেমে থেমে পাখি বলে।

—কেন? কেন? গোলাপকুমারেরা বলে।

—একটা ওষুধের খোঁজে, আমি দুদিন দুরাত শুধু ঘুরেছি। এক বিন্দু জল খাইনি, খাবার খাইনি।

—আহা, পাখি তবে ত তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাদের কাছ থেকে মধু নিয়ে যাও।

পাখি গোলাপদের কাছে যায়, সব গোলাপ এগিয়ে আসে। এ গোলাপ বলে,—আমার কাছ থেকে নাও, ও গোলাপ বলে,—আমার কাছ থেকে নাও।

পাখি বলল, মধু ত অনেক খেলাম, এবার আমার জল চাই। আর পারছি না, জলের জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখি কোথাও জল পাই কি না।

ক্লান্ত ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে যায় প্রথমেই কমলহীরার দিকে—,

—এত চক্চকে, নিশ্চয়ই জল।

ঠক্-ঠকাস-ঠক্ পাখির ঠোঁট শক্ত হীরা ঠোকরাতে গিয়ে ফোঁটা, ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে। চোখে জল আসে।

—ওয়াক্-থুঃ-থুঃ কি বিচ্ছিরি পাথর। রেগে মেগে পাখি ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঝোপের ভিতর কমলহীরাকে।

—উঃ, পাখি যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করে। ঐ চক্মকে পাথরটা ঠোকরাতে গিয়ে ওর ঠোঁটের একটা কোণ ভেঙ্গে গেছে, মাথা ঘুরছে। পাখি আর পারে না। একে জল তেষ্টা তার উপর যন্ত্রণা, মাটিতে পড়ে যায়।

এমন সময় রাজকন্যা পদ্মকলি তার সখীদের সঙ্গে বাগানে আসে।

—আমার গলার হারের কমলহীরাটা খুঁজে পাচ্ছি না সখী, চল ত খুঁজি।

সখীরা, রাজকন্যা এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে।

—ওমা, দেখ, দেখ সখী কেমন সুন্দর একটা পাখি কি ভাবে পড়ে আছে, মরে গেল নাকি?

সখীরা দেখে বলে,—না, না রাজকন্যা পাখিটা মরেনি। দেখছ না ডানা দুটো একটু একটু কাঁপছে। মুখে একটু জল দিলে নিশ্চয়ই বাঁচবে।

—কোথায় জল পাই? হঠাৎ সুন্দর শিশিরের ফোঁটাগুলো দেখতে পেয়ে রাজকন্যা পদ্মকলি ঝরা গোলাপের পাপড়িতে করে সেই চুনি, পান্নার আর মুক্তার মত শিশিরের ফোঁটাগুলো নিয়ে এসে পাখির মুখে দিতে থাকে।

সখীরাও গোলাপের পাপড়িতে করে আরও, আরও শিশিরের ফোঁটা নিয়ে আসে।

আস্তে আস্তে পাখি চোখ খোলে, উঠে বসে।

—আঃ কি ভালই লাগছে। পাখি বলে।

—তোমার কি হয়েছিল পাখি? রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করে।

—দুদিন, দুরাত আমি শুধু উড়েছি। কোথাও জল খাইনি, খাবার খাইনি। এখানে এসে একটা ঝল্‌মলে পাথরকে জল মনে করে ঠোকরাতে গিয়েই ত এই কাণ্ড। উঃ, কি ব্যথাই পেয়েছিলাম। যা রাগ হয়েছিল না, ছুড়ে ফেলে দিয়েছি ঝোপের ভিতর পাথরটাকে।

—ওটাই বোধ হয় আমার কমলহীরা। যাবার সময় নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে বলত পাখি, কেন তুমি না খেয়েদেয়ে দুদিন, দুরাত শুধু উড়েছ?

আমার দেশের রাজপুত্র খুব অসুস্থ।

—তোমার দেশ কোথায় পাখি?

—সাত সমুদ্দুর তের নদীর পাড়ে অচীন নগরে আমার দেশ। আমার দেশের রাজপুত্র, খুব সুন্দর দেখতে সে, যেন রজনীগন্ধা ফুল।

রাজকন্যা বলল,—বাঃ, তাহলে ত খুব সুন্দর তোমাদের রাজপুত্র।

—শুধু কি তাই, নীল অপরাজিতার মত সুন্দর তার চোখ। রাজপুত্র আমাদের যেমন বীর তেমনি গুণী। যখন সে বাঁশীতে ঝরণার বা নদীর গান বাজায় তখন বনের পশু-পাখিও চুপ করে শোনে।

—পাখি, তার কি হয়েছে?

—কি জানি, কিছুদিন ধরে রাজপুত্র অরূপকুমার যুদ্ধে যান না, বাঁশী বাজান না, কারো সঙ্গে মেশেন না। চুপ করে শুয়ে থাকে শুধু। রাজ্যে সব রাজবৈদ্য হার মেনেছে। হার মেনেছে সাধু সন্ন্যাসী।

—তাহলে, তোমাদের রাজপুত্র ভাল হবেন কি করে?

—তা ত জানি না। সবাই ত বলছে রাজপুত্র বাঁচবেন না। তবে রাণীমা স্বপ্ন দেখেছেন,—মণি নয়, মুক্তো নয় কিন্তু সকালবেলা মণি-মুক্তার মত সুন্দর দেখায় অথচ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না তারই এক কৌটা যদি রাজপুত্রকে খাওয়ানো যায় তাহলে সে তক্ষুণি সুস্থ হয়ে যাবে। অচীন দেশের সবাই খুঁজছে সেই ওষুধ। আমিও সেই ওষুধের খোঁজে বেরিয়েছিলাম।

রাজকন্যা একটু চুপ করে থেকে বলল,—আমি কিন্তু সে ওষুধটা জানি।

—আমাকে বলে দাও রাজকন্যা, বলে দাও। আমি নিয়ে যাই সে ওষুধ। রাজপুত্র অরূপকুমার আবার সুস্থ হবে, হাসবে, গান করবে।

—আমি নিজেই যাব তোমার দেশে রাজপুত্রের ওষুধ নিয়ে।

—তুমি, তুমি কি করে যাবে আমাদের অচীনদেশে রাজকন্যা? আমাদের দেশের সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া। রাজকন্যা পদ্মকলি আমাদের দেশের মানুষ তোমাকে দেখলেই মেরে ফেলবে। পাখি বলে।

—নাঃ, কখনও আমাকে তোমার দেশের রাজা বা লোকেরা মেরে

ফেলবে না। তুমিও যে আমার সঙ্গে যাবে। আমার ময়ুরপঙ্ক্ষী নৌকা তোমার দেশে পৌঁছবার একদিন আগে গিয়েই তুমি সব কথা বলবে রাজাকে। রাজা, দেশের মানুষ রাজপুত্রের কথা ভেবে আমাকে মারবে না। রাজপুরীতে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে।—আর পাখি, রাজপুত্র যদি ভাল হয়ে যায় তাহলে, তাহলে কি আনন্দ বল, অচীনদেশের সঙ্গে রত্নদ্বীপের এতদিনের ঝগড়া আর থাকবে না।

—ঠিক, ঠিক বলেছ রাজকন্যা, চল কালই রওনা হয়ে যাই।

কোথায় রইল কমলহীরা খোঁজা। হীরা পড়ে রইল ঝোপের ভিতর। রাজকন্যা ভুলেই গেলেন।

রাজকন্যা সখীদের সোনার পাত্র নিয়ে আসতে বলল। সখীরা সোনাপাত্র নিয়ে এলে, সেগুলিতে রাজকন্যা শিশিরের জল ভরে নিলেন।

পরদিন সকালে রাজসভায় রাজা বসে আছেন। রাজকন্যা পদ্মকলি রাজার কাছে গিয়ে বলল,—বাবা ময়ূরপঙ্ক্ষী নৌকা সাজাতে বল আমি অচীন দেশে যাব।

রাজা চমকে উঠলেন,—সে কি, এতদূরে কোথায় যাবে? তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের ত ঝগড়া।

খবর পেয়ে রাণী ছুটে এলেন।

—না, না, তুমি আমাদের চোখের মণি তুমি কোথায় যাবে? তুমি যাবে না।

রাজকন্যা বলল,—আমি যাবই। অচীনদেশের রাজপুত্রের খুব অসুখ করেছে, বুঝি বাঁচে না। রাজবৈদ্য হার মেনেছে, হার মেনেছে সাধু সন্ন্যাসীরাও।

রাজা বললেন—তবে?

—রাজপুত্রের মা স্বপ্ন দেখেছেন,—মণি নয়, মুক্তা নয় কিন্তু সকাল-বেলা মণিমুক্তার মত সুন্দর দেখায় অথচ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না তারই এক ফোঁটা খেলে রাজপুত্রের সব অসুখ সেরে যাবে।

আমি সে ওষুধ জানি, সে ওষুধ নিয়ে আমি অচীন দেশে যাব।

রাজা বললেন,—সেটা কি?

রাজকন্যা সোনা পাত্রে ভরা শিশির দেখাল।

রাজা বললেন,—কিন্তু, অচীন দেশের মানুষ রত্নদীপ থেকে এসেছে জানলেই মেরে ফেলবে।

—বাবা, আমার সঙ্গে এই অচীন দেশের পাখিও যাবে। আমি পৌঁছবার আগেই পাখি দেশে গিয়ে সকলকে খবর দেবে আমি রাজপুত্রের জন্য ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। অচীন দেশের মানুষ রাজপুত্র অরূপকুমারকে সকলে ভালবাসে। তাই আমাকে কেউ কিছু বলবে না।

রাণী বললেন, আমার ভয় করছে তুমি যেও না।

রাজা বললেন, সবই ঠিক, তবু আমাদের সকলের মনে ভয়, তোমায় যদি ওরা মেরে ফেলে।

রাজকন্যা পদ্মকলি, রাজা রাণী তারপর রাজসভায় সকলের দিকে চেয়ে বলল,—তোমরা কেউ ভয় পেওনা, কখনও ভয় না। অচীন দেশের রাজপুত্র যখন ভাল হয়ে যাবে, আমি তখন কি চাইব জান?

রাজা ও রাণী বললেন,—কি?

—অচীন দেশের সৈন্য যেন রত্ন দ্বীপে আর কোনদিন না আসে।

রাজকন্যা পদ্মকলির কথা শুনে রাজাচুপ করে যান, রাণী চুপ করে যান, রাজসভার সব মানুষ চুপ।

ময়ুরপক্ষী নৌকা তৈরী হল। রাজকন্যা পদ্মকলি তার সব গয়না খুলে ফেলল, খুলে ফেলল সোনার বরণ সাড়ী। সাদা সুতির কাপড় পরে, দেখায় যেন স্বেতপদ্মের মত।

রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন, কাঁদেন রত্নদ্বীপে সব লোক। রাজা কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—কবে ফিরে আসবে পদ্মকলি? রাণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে পদ্মকলি।

রত্নদ্বীপের সব মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বলল,—রাজকন্যা, রাজকন্যা,

তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

রাজকন্যা পদ্মকলি নৌকায় এসে ওঠে। ময়ূরপঙ্খী নৌকা তর্‌তর্‌ করে এগোয়। রাজকন্যা দূর থেকে জোরে জোরে বলল, আমার জন্য তোমরা একটুও ভয় পাবে না। আমি অল্প দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। তোমরা সব্বাই ভাল থেকো।

ময়ূরপঙ্খী নৌকার পালে হাওয়া লাগে। নৌকা এগোয়। দূরে, অনেক দূরে চলে যায়। বাবা, মা রাজ্যের একটি লোককেও আর চেনা যায় না।

অরও দূরে ময়ূরপঙ্খী এগোয়। আর রত্নদ্বীপের পাড়ও দেখা যায় না। জল শধু জল।

রাজকন্যা পদ্মকলির মনে কিন্তু একটুকুও ভয় নেই।

শেষ